সময়ের স্তর

আশাপূর্ণা দেবী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৬৫

সময়ের স্তর

তারপর, সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের পর সে রাত্রে বৃষ্টি শুরু হলো। সেই বৃষ্টিও ভয়ঙ্কর।

বেড়েই চলেছে মুখরতা, বেড়েই চলেছে গর্জন। জল জল, অবিশ্রান্ত জল। যেন প্রলয়ের বর্ষণ, যেন ঘোষণা করছে পৃথিবীর আজ শেষ দিন।

বিছানার মানুষরা ঘুম থেকে জেগে আরো নিবিড় করে গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছিল চাদর কম্বল কাপড়, আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে জড়িয়ে ধরছিল পার্শ্ববর্তী প্রিয়জনের কণ্ঠ, ক্রোড়বর্তী শিশুর দেহ। আর ভয়ে কেঁপে ভাবছিল, এ রাত আর শেষ হবে না। এই বৃষ্টিই পৃথিবীকে পৌঁছে দেবে শেষ দিনে।

কিন্তু যারা বিছানায় ওঠেনি সে রাত্রে?

যারা ঝড়ের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল? তারা?

তারা বুঝি সেই আশাই করছিল, করছিল সেই প্রার্থনা। এ রাত যেন সকাল না হয়, এ বর্ষণ যেন শেষ না হয়। বাড়ুক গর্জন, বাড়ুক বেগ, বাড়ুক আক্রোশ। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক পৃথিবী, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক বিধাতার সৃষ্টির কলঙ্ক-কালিমা।

কলঙ্ক বৈকি।

বর্ষণটা প্রকৃতির, কিন্তু ঝড়ের তাণ্ডবটা যে মানুষের। অথবা পশুর, যে পশু বিধাতারই সৃষ্টি। হয়তো অনুতপ্ত বিধাতা ওই পশুত্বের দিকে তাকিয়ে, আপন সৃষ্টির গ্লানিতে লজ্জায় ধিক্কারে পৃথিবীর উপর যবনিকা টেনে দিতেই চাইছিলেন। হয়তো বা অবিশ্রান্ত বর্ষণে অসতর্কতার কলঙ্ক-কালি মুছে দিতে চাইছিলেন। এমন একটা কিছু না হলে অমন ভয়ঙ্কর সময়ে আকস্মিক এমন বৃষ্টি শুরু হবে কেন?

আকস্মিকই।

সন্ধ্যার মুহূর্তে জ্যোৎস্না উঠেছিল, দীঘির ধারে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে জ্যোতি বলেছিল, 'আজ কি তিথি গো?'

মৃণাল বলেছিল, 'কে জানে। পঞ্জিকার খবর কে রাখে? তবে পূর্ণিমার কাছাকাছি একটা তিথি হবে বোধহয়।'

'বোধহয় চতুর্দশী। মা বলছিলেন কাল বাবা ভাত খাবেন না।'

মৃণাল হেসে বলল, 'মা-বাবা এখানে এসে দিব্যি আছেন, কি বল?'

'আমরাও কিছু খারাপ নেই।'

'আহা, আমরা তো ভাল থাকবই। আমাদের 'ভাল থাকা'টা মারছে কে? কলকাতার সেই দশ ফুট বাই বারো ফুট ঘরটাতেই কি 'দিব্যি' থাকি না আমরা? মা-বাবা ওই ঠাসা-গোঁজার মধ্যে কষ্ট পান।'

'কষ্ট পান কে বললে?'

'বলবার দরকার করে নাকি? রাতদিন ঝগড়াতেই মালুম।'

'ঝগড়াটা কিছু নয়', জ্যোতি হেসে ওঠে, 'দেখতে হবে দু'জনে দু'জনের থেকে দূরে দূরে থাকছে কিনা। সেটাই খারাপ। ঝগড়া ভাল জিনিস।'

'তাই নাকি? তবে আমাদেরও তো চেষ্টা করে দেখলে হয়!' হেসে ওঠে মৃণাল।

জ্যোতিও হাসে, 'চেষ্টা করে হয় না। যথাকালে আসে। যেমন চুলে পাউডার ঘষে চুল পাকানো যায় না, পাক ধরলে তবে পাকে।'

অপ্রয়োজনীয় আর অবান্তর সব কথা। দু'জনে দু'জনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকবার জন্যে কথা। হয়তো বা অর্থহীনও। কথার জন্যে কথা।

কে জানে ওই মগ্নতার অবকাশে কখন জ্যোৎস্না গেছে মুছে, কখন আকাশে উঠেছে মেঘ জমে। চমক ভেঙেছে হঠাৎ।

'এই ত্যাখো রাত হয়ে যাচ্ছে, আর বেশাক্ষণ বাইরে থাকলে বাবা বকবেন।' জ্যোতি বলে উঠেছে।

'মনে হয় না বকবেন।' মৃণাল বলে।

'মনে হয় না ?'

'উঁহু। আমরা যতক্ষণ বাইরে থাকব, ওঁরা ততক্ষণ 'দু'জনে একলা'র সুখ উপভোগ করতে পাবেন।'

জ্যোতি এবার বকে ওঠে, 'এই দেখো, যা-তা বোলো না। গুরুজন না ?'

মৃণাল অপ্রতিভ হয় না।

মৃণাল সহজ গলায় বলে, 'তাতে কি ? গুরুজন বলে কি প্রিয়জন নয় ? তবে ? প্রিয়জনের সুখ, খুশী, ভালবাসা দেখে খুশী হতে বাধা কোথায় ? আমি তো লক্ষ্য করছি ওঁদের যেন এখানে এসে বয়েসের গা থেকে অনেকগুলো বছর ঝরে পড়েছে। সেদিন কী উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল বাবাকে, যখন মাকে বলছিলেন, "এই উঠোনে দুধে-আলতা না কি সেই বসানো হয়েছিল, তুমি এসে প্রথম দাঁড়ালে, মনে পড়ে তোমার ?" দেখনি লক্ষ্য করে ?'

জ্যোতি মৃদু হেসে বলে, 'করব না কেন ? সেদিন তো আবার চুপি চুপি মা বাবাকে হেসে হেসে বলছিলেন, "মনে পড়ে ঘরটাকে ? আমাদের ফুলশয্যের ঘর !" আমি যাচ্ছিলাম, পালিয়ে এলাম।'

'ভালবাসা কখনো বুড়ো হয় না।' বলল মৃণাল। পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করল এতক্ষণে, বলল, 'খাব ?'

জ্যোতি ঠেলে দিল ওকে, 'আহা, অনুমতি নেওয়া হচ্ছে'

'তা নেওয়াই তো উচিত।'

সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে একটু বুঝি গভীর গলায়, একটু বুঝি আবেগের গলায় বলে ওঠে, 'আমরা কিন্তু বুড়ো হয়ে পরে কোথাও

দাঁড়িয়ে বলতে পারব না, "দেখ, তোমার মনে পড়ে এই ঘরে আমাদের ফুলশয্যা হয়েছিল—" '

জ্যোতিও গভীর হয়। তবু হালকা গলায় বলে, 'তাহলে সেই করুণাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের বিল্ডিংটায় গিয়ে ঠেলে উঠতে হয়।'

'যা বলেছ!' সিগারেটটা শুধু হাতে জ্বলতে থাকে।

জ্যোতি বলে, 'অথচ তোমাদের এতবড় বাড়ি রয়েছে। যাই বল, বিয়েটিয়ে ভিটেয় এসে দেওয়াই উচিত। শুধু তো ঘটা করাই বিয়ে নয়! এই যে এখানে এসে মনে হচ্ছে সাতপুরুষ ধরে তোমার পূর্বপুরুষরা এখানে বাস করে গেছেন, তোমার পিতামহীরাও এই উঠোনে দুধে-আলতার পাথরে দাঁড়িয়েছেন, এই লক্ষ্মীর ঘরে বসে লক্ষ্মীর কথা শুনেছেন, এতে কী রকম যেন একটা রোমাঞ্চ রোমাঞ্চ লাগছে না?'

'শুনে লাগছে বটে।'

'না-শুনে কিছু মনে হচ্ছে না?'

মৃণাল হাসে, 'একেবারে কিছু না বলা চলে না। সত্যি বলতে, বাবার সেদিনের কথাটা শুনে ঈষৎ আক্ষেপ হচ্ছিল।···মনে হচ্ছিল স্মৃতির জায়গা একটু থাকা ভাল। কিন্তু দায়ী আমিই। বাবা একবার কথা তুলেছিলেন, বিয়ের আনুষঙ্গিক পুজো-টুজোগুলো ভিটেয় এসে হোক, আমি যখন একমাত্র ছেলে! আমিই উড়িয়ে দিলাম। বললাম, এত বচ্ছর দেশ-ছাড়া, এখন কিনা এই ভাঙা বাড়িতে--'

'ভাঙা এমন কিছু না, তেমনি কী বিরাট! কত ঘর, কত বড় দালান, আর এই দীঘি, বাগান! যাই বল, ভাবলে অবাক লাগে এসব তোমাদের নিজেদের।'

'আমাদের শুধু? তোমার নয়?'

'আচ্ছা বাপু না হয় আমাদেরই। অথচ আমরা সেই দু'খানা

ঘরের ফ্ল্যাটে পড়ে আছি। বাড়িটা যদি কোনো বৈজ্ঞানিক কল-কৌশলে তুলে নিয়ে যাওয়া যেত—'

মৃণাল হেসে ওঠে, 'চেষ্টা করে দেখলে হয়। বিজ্ঞান যা-সব কাণ্ড করছে! তবে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করবে কোথায় সেই ভাবনা। এক যদি মাথায় করে বেড়াতে পারো।'

'না না, তুমি যাই বল, ভীষণ আক্ষেপ হচ্ছে আমার এই অপচয়ে। আচ্ছা তোমরা কতদিন আসনি?'

মৃণাল বলে, 'বহুকাল। সেই তো কবে ছেলেবেলায়! ওই আর কি, দেশ ভাগের বেশ আগে থেকে দেশ-ছাড়া। পরে বাবা এক-আধবার এসেছেন, আর মোটেই নয়। যা বর্ডারে, চলেই তো যাচ্ছিল প্রায় ওদিকে, নেহাত ভাগ্যের জোরে এ ভাগে পড়ল শেষ অবধি। তাও প্রথম দিকে ঝামেলা কম ছিল না। নেহাত এ-যাবৎ জ্যাঠামশাই ছিলেন, তাই বেদখল হয়নি, নয়তো হয়ে বসত। জ্যাঠামশাই মারা গেলেন, এখন—'

'এখন আমরা দখলে রাখব—' জ্যোতি দৃঢ়স্বরে বলে, 'সত্যি বলব, বিয়ে হয়ে পর্যন্ত আমার ঝোঁক ছিল এখানে একবার আসবার। পাড়া-গাঁ কখনো দেখিনি।'

'তা বলতে কি, তোমার জেদেই আসা হয়ে উঠল। এখন কিন্তু সত্যিই ভাল লাগছে, আর আপসোস হচ্ছে এতদিন না-আসায়।'

'আর ক'দিন ছুটি আছে তোমার?' জ্যোতি বলে আলগা গলায়।

'আর ক'বার জিজ্ঞেস করবে কথাটা?' মৃণাল হেসে ওঠে, 'পরশুই তো যেতে হবে।'

'আমরা আবার আসব কিন্তু।'

'এলেই হয়। কতই বা দূর, কতই বা খরচ!'

'অথচ কুড়ি বছর আসনি। তার মানে দেশকে ভালবাস না।'

'দেখ জ্যোতি, ভালবাসি না বললে ঠিক বলা হয় না। কিন্তু

অনেক ভালবাসা আমাদের মনের গভীরে ঘুমিয়ে থাকে, ব্যবহারিক জগতে টেনে না আনা পর্যন্ত তাকে চেনা যায় না।'

জ্যোতি হঠাৎ বলে ওঠে, 'না-ভালবাসাটাও হয়তো তাই। মনের গভীরে লুকিয়ে থাকে, ব্যবহারিক জগতে টেনে না আনলে বোঝা যায় না এটা আসলে না-ভালবাসা, এতদিন মনে করতাম বুঝি ভালবাসা।'

'তোমার থিওরিতে আমি আপত্তি করছি। মনে হচ্ছে আমার কিছু ভয় করবার কারণ ঘটছে। হয়তো শুনবো তোমার ভালবাসাটা স্রেফ্ না-ভালবাসা।'

'ইস, তাই বৈ কি!' জ্যোতি বলে উঠেছিল, 'ঢং রাখো! কিন্তু সত্যি, এই বাড়িটা নিয়েই এসব কথা মনে হচ্ছে আমার। বাবা যখন এ-বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে আস্তে আস্তে হাত বুলোন, মেজেয় পা ঘষে ঘষে পা ফেলেন, পুরনো জানলাগুলো আস্তে ঠুকে ঠুকে দেখেন, মনে হয় যেন বুকভরা ভালবাসা নিয়ে করছেন এসব। অথচ এতদিনে একবারও আসতে ইচ্ছে হয়নি, সারাতে ইচ্ছে হয়নি। আবার যখন কলকাতায় ফিরে যাওয়া হবে, হয়তো একেবারে ভুলে যাবেন এখানে ওঁর এতখানি ভালবাসার বস্তু পড়ে আছে। তার মানেই চোখের আড়ালে গেলেই মনের আড়ালে!'

'সর্বনাশ! ইতিমধ্যেই এত কথা ভাবা হয়ে গেছে?' মৃণাল ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, 'ভাবনাটা একটু কম কর গিন্নী! মানুষ অবস্থার দাস, এইটাই হচ্ছে সার কথা! এখানে আনন্দ ছিল, সেই আনন্দটার উপর এসে চেপে বসল আতঙ্ক। সেই আতঙ্কই যে এদিকে তাকাতে দেয়নি। এখন আতঙ্কটা কিছু কমেছে, তাই আসা গেল। নইলে কেবলই তো জ্যাঠামশাইয়ের চিঠিতে পাড়াপড়শীর গরু চুরি আর জরু চুরির খবর-বার্তা যেত।'

জ্যোতি এবার হেসে ফেলে, 'দুটো বস্তু প্রায় একই পর্যায়ের, কি বল?'

'যাদের ভাষা ওটা—তাদের কাছে নিশ্চয়ই। আমাদের মতো বাংলা ভাষায় অমন কুশ্রী একটা উদাহরণ পাবে না।'

জ্যোতি গাঢ় গলায় বলে, 'আচ্ছা, এখনো কি আতঙ্ক আছে?'

মৃণাল হেসে ওঠে, 'কেন বল তো, এখানেই বসবাস করবে ঠিক করছ নাকি?'

'আহা, আমি যেন পাগল! আমার ইচ্ছে, এটাকে সারিয়ে-টারিয়ে আমাদের ছুটিতে চেঞ্জে আসবার জায়গা করব। মা-ও এ পরিকল্পনায় খুশী। বলেন, তোমরা এলে আমারও একটু আসা হয়। তবে বাবা কি বলছিলেন জানো?'

জ্যোতি হেসে ওঠে, 'বাবার উপমাটি বেশ। বলছিলেন, 'খরচ-পত্র করে সারিয়ে আর কি হবে বৌমা, এসব জায়গা পড়ে আছে যেন বেড়ালের সামনে ঢাকনা খোলা মাছের মতো। কখন যে থাবা বসায়!'

মৃণাল বলে, 'তুমি বুঝি সারানোর জন্যে বায়না করেছ?'

'করেছিই তো। এখানটা যে কী ভাল লেগেছে আমার! মনে হচ্ছে যেন এর সঙ্গে কী এক আকর্ষণে বাঁধা পড়ে গেছি!··· মনে হচ্ছে—'

'আচ্ছা কল্পনাময়ী, তোমার এই ভগ্ন-প্রাসাদে এসে আরো কী কী মনে হচ্ছে পরে শোনা যাবে। রাত্রে তো আর ঘুমের পাট নেই? এখন চল। জ্যোৎস্না তো কখন বিদায় নিয়েছে। খেয়াল করিনি, চল, চল।'

উঠে পড়েছিল মৃণাল। জ্যোতিও উঠেছিল।

হঠাৎ নিথর নিস্তব্ধতার উপর আচমকা একটা গোলমালের ধাক্কা লাগল।

একটা আর্তনাদ! অনেকটা উল্লসিত গর্জন! অশুভ শব্দ! অশুভ স্বর!

কী এ?

জ্যোতি ভয়ে মৃণালকে জড়িয়ে ধরে, 'কী! কী! কীসের হল্লা ?'

মৃণালও ভয় পায় বৈকি !

এ হল্লা যে বহুবারের চেনা। তবু সাহসে ভর করে বলে, 'বুঝতে পারছি না, হঠাৎ কোথাও কেউ মারা-টারা গেল নাকি ?'

ওরা ছুটতে থাকে দীঘির পাড় থেকে বাড়ির দিকে।

আর শুনতে পায় একসঙ্গে দুটো গলা তারস্বরে ডাক দিচ্ছে—'মৃণাল···বৌমা !'

ভাঙা-ভাঙা ভয়-পাওয়া গলা।

ভয়ই পেয়েছেন।

ওঁরাও ওই আচমকা হল্লা আর আর্তনাদ শুনতে পেয়েছেন। ভক্তিভূষণ আর লীলাবতী। ওঁরা তাই ওঁদের একমাত্র অবলম্বন আর একমাত্র ভরসাকে ডাক দিচ্ছেন—'মৃণাল···বৌমা !'

॥ ২ ॥

মৃণাল বলেছিল 'ভালবাসা বুড়ো হয় না।' ওটা ওর ভুল ধারণা। ভালবাসাও বুড়ো হয় বৈকি! সেই বার্ধক্য ধরা পড়ে চাঞ্চল্যে, উৎকণ্ঠায়, অস্থিরতায়। বুড়ো হয়ে যাওয়া ভালবাসা 'দু'জনে একলা' নিমগ্ন হয়ে থাকতে বেশিক্ষণ পারে না! আশেপাশে তাকায়, দেখে নেয় সব ঠিক আছে কিনা।

লীলাবতীও দেখছিলেন।

দু'জনে পুরনো পালঙ্কে বসে পুরনো দিনের স্মৃতি-রোমন্থন করতে করতেও উঠে উঠে দেখে আসছিলেন. রান্নাঘরের দরজায় শিকল নড়ার মতো শব্দ হলো কেন ? কোথায় একটা বেড়াল লাফালো যেন।··· মৃণালের ঘরটা বন্ধ করে গেছে, না হাট করা পড়ে আছে ? উঠোনের দড়ি থেকে শুকনো কাপড়গুলো তোলা হয়েছে কিনা।

আর ভক্তিভূষণ বার বার সদরের কাছে ঘুরে আসছিলেন ওরা ফিরছে কি না দেখতে।

প্রত্যেকবারই ফিরে এসে বলেছেন, 'গেল কোথায়? বলে গেছে কিছু?'

'বললাম তো—' লীলাবতী উত্তর দিয়েছেন, 'বলে গেল, এই একটু চাঁদের আলোয় ঘুরে আসি। এত দেরি করবে কি করে জানব?'

'চাঁদের আলোয় ঘুরে আসি! আশ্চর্য! অজানা-অচেনা জায়গা, সাপ-খোপ আছে কিনা ঠিক নেই, নাঃ, ভাবালে!'

লীলাবতী বারকয়েক বলেছেন, 'শুধু শুধু অত ভাবছ কেন? এই তো দু-দিন গেলেই ছুটি শেষ! বেড়াতেই তো এসেছে। দিনের বেলা রোদের জ্বালায় বেশি বেড়াতে পারে না তো।···তাই ভাবছি— কাল কত বদলায়! আমাদের আমলে ঘোমটা দিয়ে ভিন্ন ঠাকুর-দালানে যাবার হুকুম ছিল না, রাস্তা তো দূরস্থান!'

'তখন দেশে লোক কত! সাতটা বাড়িতে জ্ঞাতি-গুষ্টি ভরা।'

লীলাবতী একবার অতীতে নিমজ্জিত হন, 'মনে আছে তোমার, একবার তোমাতে আমাতে অনেক রাত্তিরে ছাতে উঠেছিলাম, তাই নিয়ে কী টি-টি!'

ভক্তিভূষণ অবশ্য মনে করতে পারেন না।

বলেন, 'তা হবে। কিন্তু এরা তো দেখছি ভাবনায় ফেলল। বৌমাটির তো সবই ভাল, বড্ড বেহুঁশ এই দোষ।'

লীলাবতী বৌয়ের সপক্ষে হন, 'ও ছেলেমানুষ, কখনো মাঠ-ঘাট বাগান-পুকুর দেখেনি, দেখছে আর বিগলিত হচ্ছে। মৃণালেরই উচিত—'

সহসা কথা থামালেন। সহসা কান খাড়া করলেন।

চমকে বললেন, 'কী হলো? কী ও? কোথায় গোলমাল?'

ভক্তিভূষণ আরো চমকালেন।

ভক্তিভূষণ বাইরের দরজার দিকে ছুটে গেলেন। এই জীর্ণ প্রাসাদটার শূন্য ঘরগুলো থেকে যেন একটা ভয়ের ঝাপ্‌টা হা-হা করে বয়ে গেল। মিশে যেতে লাগল কোন্ এক নারকীয় কোলাহলের সঙ্গে।

ভক্তিভূষণ দরজাটা খুলে ধরে চেঁচাতে লাগলেন, 'মৃণাল—বৌমা !'

বেরিয়ে যেতে পারলেন না। লীলাবতীকে একা ফেলে যাবার কথা ভাবতে পারলেন না। শুধু গলাটাকে যতটা সম্ভব বাড়িয়ে আর স্বরটাকে যতদূর সম্ভব চড়িয়ে ডাক দিতে লাগলেন, 'মৃণাল—বৌমা !'

লীলাবতীও সরে এসেছেন, স্বামীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন, আর্তনাদ করছেন, 'মৃণাল—বৌমা !'

॥ ৩ ॥

তারপর বাড়তে লাগল সেই আর্তনাদ।

সংক্রামক রোগের মতো ছড়াতে লাগল সারা পাড়ায়, সমস্ত পাড়াটা জুড়ে আর্তনাদ যেন আছড়া-আছড়ি করতে লাগল।

যেন পণ করেছে আকাশ বিদীর্ণ করবে, সমস্ত পৃথিবীকে জানাবে, 'লুঠেরা' এসেছে। লুঠ করছে জরু গরু। লুঠ করছে সম্মান সম্ভ্রম, শান্তি শৃঙ্খলা।

যারা নিশ্চিন্ত শান্তির নিশ্বাস ফেলে ভেবেছিল আর কোনো ভয় নেই, তাদের সেই নিশ্চিন্ততার উপর এসে পড়েছে জ্বলন্ত মশাল। কে জানে কোথায় কে সলতে জ্বেলে দিয়েছে বারুদঠাসা কামানে!

কে বলতে পারে বারুদই বা ঠাসা থাকছে কেন কামানে ?

কেউ বলতে পারবে না, কেন এখনো এত আগুন, কেন অব্যাহত এই বর্বরতার নমুনা ?

কেউ জানে না, কি থেকে কি হয়। শুধু চোখ মেলে দেখে—

ঘর জ্বলছে, শস্যের সম্বল জ্বলছে, জীবনের পরম সঞ্চয়গুলি জ্বলে যাচ্ছে।

॥ ৪ ॥

কিন্তু এ আগুন কি ইতিহাসের পাতায় কলঙ্করেখা এঁকে রাখবে?

রাখবে না। অত বেশি পাতা নেই ইতিহাসের খাতায়। শুধু হয়তো খবরের কাগজের পাতার কোনো একটি কোণে ঠাঁই নেবে, স্থানীয় সংবাদদাতার পত্রে, 'সীমান্ত এলাকায় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতীত অবস্থা শান্ত আছে।'

সেই 'বিচ্ছিন্ন' ঘটনাগুলির তীক্ষ্ণ দাঁত কী কী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করল, তা জানবার গরজ সংবাদদাতার নেই। কারই বা জানতে গরজ!

মৃণালের জ্যাঠামশাই যখন মাঝে মাঝে পাড়ার লোকের জরু গরু লুঠ হওয়ার সংবাদ দিতেন, মৃণাল কি জানতে উৎসুক হতো কে তারা? কোথায় গেল তারা?

শ্মশানে তো চিতা প্রত্যহই জ্বলে, উদয়াস্তই জ্বলছে, তার জন্যে কি সবাইয়ের বুক জ্বলছে? বিচ্ছিন্ন ঘটনা বিচ্ছিন্নই থাকে।

'জ্যোতি' নামের একটুকরো আলো, একটুকরো ঔজ্জ্বল্য যে খসে পড়ল 'মৃণাল' নামের প্রাণটা থেকে, লীলাবতী আর ভক্তিভূষণের ভালবাসা দিয়ে গড়া একখানি ছবির মতো সংসার থেকে, এ শুধু ওরাই জানল।

আরো অনেককে জানাবার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে তারও উপায় থাকল না। কারণ, তারপর, সেই ঝড়ের পর বৃষ্টি শুরু হলো।

অনুতপ্ত সৃষ্টিকর্তার অশ্রুজলের মতো!

কিন্তু বিধাতার অনুতাপ বোধকরি মাতালের অনুতাপের মতোই

অস্থায়ী। তাই যারা প্রার্থনা করছিল, 'আজকের রাত যেন আর শেষ না হয়', তাদের প্রার্থনাকে ব্যঙ্গ করে যথাসময়ে রাত্রি শেষ হলো, আর নির্লজ্জ আকাশ দিব্য চোখ মেলে দেখতে লাগল অসহায় পৃথিবীটাকে কতখানি বিধ্বস্ত করা গেছে। দেখল—

ভক্তিভূষণের জীর্ণ বাড়িখানা, যে নাকি এই ক'দিনের হাসি-আহ্লাদ আর আলো-রোদ্দুরের প্রসাদে ঝকমকিয়ে উঠেছিল, সে ওই পর্যাপ্ত বর্ষণে শোকাচ্ছন্ন ক্রন্দনাতুরের মতো পড়ে রয়েছে যেন ধূলিসাৎ হবার অপেক্ষায়। তার মধ্যে তিনটে প্রাণী বসে আছে মূক হয়ে, কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে।

বৃষ্টির গর্জনকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যে নামটা উচ্চারণ করছিলেন লীলাবতী সারারাত ধরে, সে নামটা যেন কোন্ এক অলিখিত শাসনে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। দিনের আলোয় সে নাম আর উচ্চারণ করা চলবে না যেন। কেউ যেন না টের পায় ভক্তিভূষণ ঘোষ দু'দিনের জন্যে পৈতৃক ভিটেয় বেড়াতে এসে সবচেয়ে দামী জিনিসটা খুইয়ে চোরের মতো পালিয়ে গেল।

॥ ৫ ॥

'তোমরা চলে যাও।' অন্যদিকে তাকিয়ে প্রেতাহতের মতো উচ্চারণ করে তিনজনের একজন, 'তাহলে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। ভাববে সবাই চলে গেছে—' গলা ঝাড়ল, থেমে বলল, 'শুধু আমি আছি, বাড়িটা দেখছি আরো ক'দিন।'

বলল না, ওকে কেন থাকতে হবে, তবু বোঝা গেল কেন থাকবে।

বোঝা গেল, ও খুঁজবে, ও প্রতীক্ষা করবে।

আর একজন অনেকক্ষণ পরে বলল, 'কে জানে আরও কার কি সর্বনাশ হয়ে গেল!'

বাকী জন বলল, 'জানা যাবে না। কেউ বলবে না। সর্বস্ব

হারিয়ে সহজ হয়ে বেড়াতে চেষ্টা করবে, সেই হারানোর খবরটা লুকিয়ে ফেলবার জন্যে মিথ্যের পাঁচালী গাঁথবে।'

তিনজনই মনে মনে বলল, যেমন আমরা করতে চলেছি।

'আমি যাব না মৃণাল, আমি কোন্ প্রাণে তোকে ফেলে রেখে চলে যাব ?'

বললেন লীলাবতী। বিকৃত বিদীর্ণ গলায়।

ভক্তিভূষণ বললেন, 'আজ কারুরই যাওয়া চলে না।'

তারপর খানিকক্ষণ সেই কাদায়-হাঁটু-বসে-যাওয়া গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াবার মতো হাস্যকর পাগলামী করে ফিরে এল দু'জনে।

বাপ আর ছেলে। আধপোড়া কাঠের মতো দেখতে লাগছিল যাদের।

দেখল, লীলাবতী চুপি চুপি বলছেন, 'বৌমা, বৌমা! নিয়তি তোমায় এখানে তাড়িয়ে নিয়ে এল, আমি কেন তখন বুঝতে পারলাম না ? তোমার জেদ দেখে কেন ভয় পেলাম না ?'

নিয়তি! এতক্ষণে যেন তীব্র তীক্ষ্ণ একটা প্রশ্নের উত্তর পেল মৃণাল। নিয়তি! নিয়তি ছাড়া আর কে ? নিয়তি ব্যতীত আর কে পারত বিশ বছর পরে মৃণালকে তার পরিত্যক্ত পিতৃভিটেয় টেনে আনতে ? নিযতি ছাড়া আর কার সাধ্য ছিল, অজানা এই জায়গায় অত রাত পর্যন্ত খোলা আকাশের নীচে বসিয়ে রাখতে মৃণালকে যুবতী স্ত্রীকে পাশে নিয়ে ?

মৃণাল কি জানত না, এখানে নিরাপত্তার অভাব ? মৃণাল কি জানত না, ওদের এই গ্রামটা বেড়ালের থাবার সামনে পড়ে থাকা মাছের মতো ?

॥ ৬ ॥

মৃণাল জানত সে-সব।

তবু মৃণাল ভয়ানক একটা দুঃসাহসের কাজ করেছে। অতএব নিয়তি! মৃণাল বুঝতে পারছে লীলাবতী আর ভক্তিভূষণ এখন ওর দিকে অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন না, কারণ এখন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুক ফেটে যাচ্ছে ওঁদের। কিন্তু তাকাবেন এর পরে।

প্রথমে নীরব অভিযোগের দৃষ্টিতে, তারপর তীব্র তিরস্কারের রূঢ়তায়।

ওঁরা বলবেন, 'তুই! তুই এর জন্যে দায়ী! তুই-ই এই কাজ করলি। তুই যদি রাতদুপুর অবধি বৌ নিয়ে দীঘির ধারে বসে থাকতে না যেতিস!'

তখন মৃণাল কপালে হাত ঠেকিয়ে বলতে পারবে, 'নিয়তি!'

নইলে আত্মহত্যা না করে বেঁচে থাকবে কি করে?

অথচ বেঁচে থাকতেই হবে।

জ্যোতির জন্যেই বাঁচতে হবে। জ্যোতির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

অপেক্ষা করবে, সন্ধান করবে, আর সেই কলকাতার বাড়ির দশ ফুট বাই বারো ফুট ঘরের সেই জানলার ধারের বিছানাটা থেকে শুরু করে পর পর ঘটনাপঞ্জী সাজিয়ে নিয়ে নিয়তির অমোঘ নির্দেশ দেখবে।

ঘর অন্ধকার ছিল।

বালিশের উপর মাথাটা উঁচু করে রেখে জ্যোতি বলেছিল, 'আমার বাহাদুরীর তারিফ কর। বাবাকে রাজী করে ফেলা হয়েছে।'

'বাবাকে রাজী?' মৃণাল বলেছিল, 'সে আর শক্ত কী?

'বৌমা'র ইচ্ছে! এর ওপর তো আর দু'বার অনুরোধের প্রশ্ন নেই।'

'আহা রে! মোটেই তা নয়। ঢের তুতিয়ে-পাতিয়ে তবে, বুঝলে? বাবার ধারণা আমি নাকি সেখানের অসুবিধে সহ্য করতে পারব না। দেখিয়ে দেবার জন্যেই যেতে হবে আমাকে।'

'মা'র মত করিয়ে নিয়েছ তো?'

'মা? শোনো কথা! সে তো আগেই। মাকে মতে না আনিয়ে বাবাকে বলতে যাব?···ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাবার মতো বোকা নাকি আমি?'

অন্ধকারে ভাল করে মুখ দেখা যাচ্ছিল না, তবু বোঝা যাচ্ছিল আহ্লাদে মুখটা ঝলসাচ্ছে ওর।

এ আহ্লাদ কার? অবশ্যই নিয়তির।

লীলাবতীও তাই বলছেন, 'ওর ওই আসবার জন্যে পাগলামী দেখে ভয় হচ্ছিল আমার। সত্যবন্দী করিয়ে নিয়েছিলাম পুকুরে চান করবে না। জলের ভয় করেছিলাম আমি, নিয়তি যে আগুন হাতে নিয়ে বসেছিল তা তো ভাবিনি।' আরো কত কথাই বলছিলেন লীলাবতী চাপা শোকের গলায়। কারণ লীলাবতী আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভক্তিভূষণ কিন্তু তা দিচ্ছিলেন না, মৃণালও না।

ওদের মাথার মধ্যে খেলছিল, কী ভাবে থানায় খবর দিতে হবে, কী ভাবে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে, আর কী ভাবে সন্ধান নিতে হবে কারা এসেছিল লুঠ করতে! কোন্ পর্যন্ত তাদের গতিবিধি!

কিন্তু আশা কি সত্যিই ছিল? ওরা কি পৃথিবীকে দেখেনি? দেখছে না? দেখছে প্রতিনিয়তই।

তবু ওরা জানে, বসে বসে বিলাপ করাটা ওদের পক্ষে বেমানান।

অথচ আস্ত একটা মানুষ লুঠ হয়ে গেলে কী কী করা সঙ্গত, তা ওরা জানে না। ওরা দেখেনি কোনোদিন এ ঘটনা। ওরা শুধু শুনেছে।

শুনে 'আহা' করেছে, হয়তো বা শুনে শিউরে উঠেছে, কিন্তু তারপর তারা কি করেছে সেটা কান দিয়ে শোনেনি।

তাই বুঝতে পারছে না এরপর কী কী করবে।

॥ ৭ ॥

ওই বৃষ্টিটাই কাল হয়েছিল। ভয়ানক একটা মুহূর্তে হঠাৎই প্রবল বিক্রমে এসে গেল, কে কোথায় ছিটকে গেল।

তবু মৃণাল যখন ওর মা-বাবার ডাকে ছুটে আসছিল তাঁদেরই কোনো বিপদ হলো ভেবে, তখন ভেবেছিল জ্যোতি বাড়ি পৌঁছে গেছে। ভেবেছিল, ছুটতে খুব ওস্তাদ তো, পৌঁছে গেছে বাড়িতে।

এ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না বলেই ভেবেছিল।

মৃণালের কোনো ভাবনাই কাজে লাগল না।

আরো তো কত কি ভেবেছে মৃণাল। ভেবেছে, বোধহয় ছুটে গিয়ে অন্য কারো বাড়ি ঢুকে পড়েছে, বোধহয় কোনো ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে আছে, বোধহয় ভয়ে কোথাও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

তারপর সব ভাবনা স্থির হয়ে যাচ্ছে।

ক্রমশঃ পাথর হয়ে যাচ্ছে, নিথর হয়ে যাচ্ছে।

শুধু বলছে, 'তোমরা যাও, আমি যাব না।'

লীলাবতী ভয়ে কাঁটা হচ্ছিলেন, যে ঝিটাকে এখানে এসে ঠিক করেছিলেন, সে এসে দাঁড়ালে কী বলবেন তাকে।

যদি বলে ওঠে, 'মা, বৌদিদিকে দেখছি না যে?' কোন্ উত্তর জুগিয়ে রাখবেন সেই প্রশ্নের জন্যে?

কিন্তু ঈশ্বর রক্ষা করলেন। মেয়েটা এলই না।

অনেকক্ষণ পরে মনে পড়ল লীলাবতীর, আসবে কি করে?

আসা অসম্ভব! গতকালের দুর্যোগে হয়তো তার চাল উড়ে গেছে, হয়তো সর্বস্ব নষ্ট হয়ে গেছে।

'তাহলে আসবে না।' ভাবলেন লীলাবতী। ভেবে শান্তি পেলেন।

অপর কারো চাল উড়ে গেছে অনুমান করে শান্তি পেলেন।

হয়তো নিজের চাল উড়ে গেলে এমনি নির্মম আর নির্লজ্জ হয়ে ওঠে মানুষ, তা নইলে এ কথাই বা লীলাবতী ভাবলেন কী করে, ভগবান, গ্রামে এত বৌ-ঝি সবাইয়ের সব থাকলো, যেতে আমারটিই গেল! দু' দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছিলাম আমি!

তারপর আস্তে আস্তে সেই অভিযোগ জন্ম নিতে লাগলো, 'ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে এই বিপদ ডেকে আনা হলো! ভয় নেই লজ্জা নেই, গুরুজনের সামনে সমীহ নেই, রাতদুপুর অবধি দীঘির ধারে বসে প্রেমালাপ! এত বড় বাড়ি, এত ঘর দালান বারান্দা, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া অতবড় ছাত! কোনোখানে কুলোল না তোমাদের, দুঃসাহসেরও যে সীমা থাকা উচিত সে খেয়াল হলো না!'

কিন্তু এ অভিযোগ কি মৃণালের বিরুদ্ধে?

না! লীলাবতীর মনের মধ্যে যে অভিযোগ উত্তাল হয়ে উঠছে, সেটা ছেলের বিরুদ্ধে নয়। যে বৌয়ের জন্যে তাঁর সমস্তটা জীবন ছিন্নভিন্ন ক্লেদাক্ত হয়ে গেল, যার জন্যে ভবিষ্যৎটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল, আর কোথাও কোনোখানে মুখ দেখাবার পথ থাকলো না, সেই বৌয়ের বিরুদ্ধেই সমস্ত অভিযোগ।

তাঁর নিজের ছেলেও যে ওই একই অপরাধে অপরাধী, আর বৌটার থেকে যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে বয়সে সব দিক থেকেই বড়, সে কথা এখন আর খেয়ালে আসছে না লীলাবতীর, মনে হচ্ছে—ওই বৌ! ওই বৌটিই তাঁর যারপর-নাই বেঁহুশ, অবুঝ, জেদী, আহ্লাদী!

বৌমানুষ হয়েও বৌমানুষ-জনোচিত কোনো সঙ্কোচ কুণ্ঠা ছিল না তার। তার উপর আবার অভিমানিনী।

অথচ তা না হওয়াই উচিত ছিল।

তিনকুলে কে ছিল যে এত আহ্লাদী হয়েছ? কোন্ বাল্যে মা মরেছে, তারপর বাপ। পিঠোপিঠি দুই ভাইবোন, একজন মানুষ হয়েছে মাসীর বাড়ি, আর একজন পিসীর বাড়ি। এই তো দশা!

তবু এতটুকুতে মান অভিমান, মৃণালটা আমার যেন নাস্তা-নাবুদ! হ্যাঁ, এই সবই ভাবছেন এখন লীলাবতী, বৌয়ের ভয়েই ছেলে আমার কাঁটা। নইলে এই সাপখোপের দেশে রাত্তিরবেলা দীঘির পাড়ে বসে থাকে?

বরাবরই ওই!

ঘরে বসে প্রেম হয় না বৌয়ের, কেবল বাইরে বেরোনোর তাল। বলা হতো কিনা—'বাবাঃ, এই ছোট্ট ঘরটুকুর মধ্যে বসে থেকে থেকে মাথা গরম হয়ে গেল! একটু রাস্তায় ঘুরে আসি।'

মেয়েমানুষ, মাথা ঠাণ্ডা করতে চললেন রাস্তায়! কেন, লীলাবতীর 'মাথা' বলে একটা জিনিস নেই? কই, লীলাবতী তো ও কথা বলতে যান না? হলো তো এখন! নাও, এখন মাথায় কত হাওয়া লাগাবে লাগাও।

ক্রমশঃই লীলাবতীর মনের মধ্যেকার ধারণা এমন চেহারা নিতে থাকে, যেন জ্যোতি ইচ্ছে করেই এটি ঘটিয়েছে।...ভাবছেন, ছেলের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, আর বুকটা হু হু করে উঠছে তাঁর।

জ্যোতির হারিয়ে যাওয়াটা যদি আকস্মিক একটা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হতো, হয়তো লীলাবতী তাঁর সেই হারিয়ে-যাওয়া বৌয়ের দোষগুলো সব ভুলে যেতেন। এবং তার কত দিকে কত গুণ ছিল, তারই ফিরিস্তি আওড়াতে বসতেন।

কিন্তু জ্যোতি মৃত্যুর পবিত্রতার মধ্য দিয়ে হারায়নি। হারিয়েছে

একটা পঙ্ককুণ্ডের মধ্যে। লীলাবতীর তাই তার উপর মমতার বদলে ঘৃণা আসছে, করুণার বদলে বিতৃষ্ণা।

তবু শোকে দুঃখে লজ্জায় যেন মরে পড়ে আছেন লীলাবতী। লীলাবতীর ঘরের বৌকে গুণ্ডায় লুঠ করে নিয়ে গেছে, এই ভয়ঙ্কর অনুভূতিটা যেন প্রতি মুহূর্তে লীলাবতীকে করাত দিয়ে কাটছে।

ছেলের কালিমেড়ে-যাওয়া উপবাস-ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা তাঁর ফেটে গেলেও, গা হাত তুলে তার জন্যে খাবার জোগাড় করতে যেতে পারছেন না।

শিকল দেওয়া রান্নাঘরটা, শিকল দেওয়াই পড়ে আছে। ওটা হাতে করে খুলতে পারছেন না লীলাবতী। যেন ওই ঘরটা খুললেই কেউ হা হা করে হেসে উঠবে। যেন লীলাবতীর গলা টিপে ধরতে আসবে রূঢ় কর্কশ মোটা মোটা আঙুল দিয়ে।

সেই ঝড়ের সন্ধ্যার আগে ওই ঘরে বসে লুচি বেলেছিল 'জ্যোতি' নামের মেয়েটা, এখন যেটা একটা ডেলা পাকানো ভয় হয়ে বসে রয়েছে। সেই লুচিগুলো ঢাকা দেওয়া পড়ে আছে ওঘরে এখনো।

ওঘরের দরজাটা তবে কি করে খুলবেন লীলাবতী?

তা'ছাড়া—আরো একটা কারণ, আর হয়তো বা সেটাই প্রধান কারণ, যা নাকি লীলাবতী এখন নিজেও প্রধান বলে টের পাচ্ছেন না, সে কারণটা হচ্ছে—যে ছেলের জন্যে মাথা তুলে রান্নাঘরে যাবেন, সেই ছেলে কী বলবে? সে কি মাকে ধিক্কারে ডুবিয়ে দিয়ে বলে উঠবে না, 'ছি ছি মা, জ্যোতি হারিয়ে গেল, অথচ তুমি আবার যথারীতি রান্নাঘরে ঢুকে তোড়জোড় করে রান্না লাগিয়ে দিয়েছ?'

যদি বলে, 'খেতে আমার প্রবৃত্তি নেই মা, খাবার ক্ষমতাও নেই, আমায় অনুরোধ করতে এসো না।'

তখন?

ওই আতঙ্কই আরো লীলাবতীকে আটকে রেখে দিয়েছে। তাই

লীলাবতী বুড়ো স্বামীর কথা ভাবতে গিয়ে থেমে যাচ্ছেন, ছেলের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন না। মড়ার মতো পড়েই আছেন একধারে।

কিন্তু সেই ঝড়ের সন্ধ্যাটা কবে গেছে?

কত যুগ আগে?

ক্যালেণ্ডারের পাতা না কি বলছে সেটা মাত্র পরশুর সন্ধ্যা।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

কত কত যুগ যেন কেটে গেছে মনে হচ্ছে যে!

মাত্র তিনবেলা না খেলে এমন অবস্থা হয় মানুষের? লীলাবতীর কত বার-ব্রতের অভ্যাস আছে। লীলাবতীরই যদি এমন হয়, কী হচ্ছে মৃণালের, কী হচ্ছে ভক্তিভূষণের?

অন্ততঃ একটু চা—

চা ভাবতেই বুকটা হু হু করে উঠলো লীলাবতীর, আর যে বৌয়ের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ জমিয়ে তুলছিলেন, হঠাৎ তার মুখটা মনে পড়ে গিয়ে চোখের জলে ভেসে গেলেন।

চা খেতে আর খাওয়াতে, দুটোই সমান ভালবাসত জ্যোতি। অসময়ে হেসে হেসে বলে উঠত, 'মা, নিশ্চয় এখন আপনার খুব ইচ্ছে করছে চা খেতে?'

লীলাবতী যদি বলতেন, 'নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছে তাই বলো না বাছা?'

জ্যোতি হেসে বলত, 'সেটা বললে ভাল দেখাবে না।'

তারপর যত্ন করে নিয়ে আসত চা বানিয়ে। জ্যোতি এসে পর্যন্ত চা তৈরি ভুলেই গেছেন লীলাবতী।

চায়ের সরঞ্জামগুলোর দিকে তাকানো যাচ্ছে না, তবু লীলাবতী চোখ মুছতে মুছতে সেই ভুলে যাওয়া কাজটাতেই হাত দিলেন। ভয়ে ভয়ে নিয়ে গেলেন দুটো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা মানুষের দিকে।

স্তব্ধ পাথর!

এখানে সন্ধ্যার পর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় কি?

কিছু করবার উপায় কি? পথ কোথায়? থানা পুলিস? কেলে ছড়িয়ে পড়া ছাড়া আর কোন্ মহৎকর্ম হবে?

কিন্তু চায়ের পেয়ালাটার ধাক্কায় সেই পাথর পাথর মানুষ দু'টো কি সহসা সচেতন হয়ে উঠল? তারা কি লীলাবতীর হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো?

আর বলে উঠলো, চা এনেছ? চা? লজ্জা করল না তোমার? লজ্জা?

অদ্ভুত আশ্চর্য!

মোটেই তা করল না ওরা।

বরং যেন আগ্রহের সঙ্গে নিল হাত বাড়িয়ে।

শুধু মৃণাল বলল, 'তোমার রেখেছ?'

গলাটা কি মৃণালের?

লীলাবতীর মনে হলো এ যেন আর কেউ কথা বলল।

লীলাবতী ভাবলেন, আমার ছেলের জীবনটা তা হলে মিথ্যে হয়ে গেল। তারপর ভাবলেন, আমার ছেলের স্বভাবেই এমনটা ভাবতে হচ্ছে আমায়। নইলে একটা মেয়েমানুষের জন্যে কি আস্ত একটা পুরুষ মানুষের জীবন ফুরিয়ে যায়?

এই কালিপড়া হ্যারিকেনের আলো, এই ছায়া ছায়া বিরাট জীর্ণ অট্টালিকা, এই উড়ো উড়ো হু হু করা বাতাস, আর এই বাক্যহীন তিনটে পাথর হয়ে যাওয়া প্রাণী!

এর মাঝখানে ওই 'ফুরিয়ে যাওয়া' ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতেই পারা যায় না।

লীলাবতী ভাবলেন, ওই বৌ-অন্তপ্রাণ ছেলেকে কোন্ সান্ত্বনা দেবো আমি? লীলাবতী ভাবলেন, কলকাতায় ফিরে গেলে হয়তো একটু সামলাতো।

কিন্তু ওকে কি এখান থেকে নড়ান যাবে?

॥ ৮ ॥

'কাল ভোরের গাড়িতে চলে যাওয়া হবে।' স্তব্ধ হয়ে থাকা ভক্তিভূষণ হঠাৎ ভাঙা ভাঙা গলায় যেন আদেশের ঘোষণা দিলেন, 'এখানে বসে থাকার কোনো মানে হয় না।'

ভক্তিভূষণ এমন আদেশের সুরে কথা কম বলেন। বলেনই না। তাই বাকি দু'জন যেন চমকে উঠল। কিন্তু কেউ কথা বলল না।

মৃণাল এতক্ষণ ওর নিজের শোবার ঘরে বসেছিল, যেখানে পরশু রাত্রেও জ্যোতি ছিল পাশে। কোথা থেকে এক মুঠো আকন্দ ফুল এনে জানলার ধারে রেখে দিয়েছিল জ্যোতি একটা কাঁসার রেকাবীতে, সেই ফুলগুলো এখনো রয়েছে। আকন্দ ফুল সহজে শুকোয় না। মৃণাল ভাবছিল, কেন শুকোয় না? ওর মধ্যে বিষ আছে বলে?

এই ঘরটায় ঢুকে প্রথমেই মনে হয়েছিল এইখানেই পড়ে থাকি। জ্যোতির হাতে গুছিয়ে রাখা বালিশ চাদরে হাত না দিয়ে মাটিতে কোথাও।

আশ্চর্য, এত বড় ঝড় বয়ে গেল এই পৃথিবীটার উপর দিয়ে, অথচ বিছানার চাদরটা ঠিক পাতা থাকল! বেড়াতে যাবার আগে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে যে চাদরটা চোস্ত করে রেখে গিয়েছিল জ্যোতি।

এই ঘরেই পড়ে থাকব, ভেবেছিল এ কথা, কিন্তু বেশীক্ষণ টিকতে পারল না। আবার বাবার ঘরে এসে বসল। সেই সময় ভক্তিভূষণ ওই ঘোষণাটি করলেন, 'কাল ভোরের গাড়িতে চলে যাওয়া হবে।'

চলে যাওয়া হবে!

এখান থেকে চলে যাওয়া হবে!

মৃণালের মনের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল। এখান থেকে চলে যাওয়া মানে জ্যোতিকে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া!

মৃণাল যেতে পারবে না।

মৃণাল এখানে থেকে জ্যোতিকে খুঁজবে, খুঁজে বার করবে।

কিন্তু মৃণাল কোনো কথা বলল না।

ভক্তিভূষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমারও তো ছুটি ফুরিয়ে গেল!'

ছুটি!

সেটা ফুরিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন!

মৃণাল যেন বিস্ময়ে কুঁকড়ে যায়।

বাবার এখন মনে পড়ছে মৃণালের অফিস আছে। তার ছুটি ফুরোনোর প্রশ্ন আছে। তার মানে মৃণাল কাল ভোরের গাড়িতে কলকাতায় ফিরে গিয়ে যথারীতি ছুটোছুটি করে অফিস যাবে, যথারীতি খাবে নাইবে ঘুমোবে!

বাবার চিন্তায় এটা এত সহজ হয়ে গেল!

অথচ মৃণাল ভাবতে পারছে না জীবনেও ওই সহজটা সম্ভব হবে কিনা।

মৃণাল কিছু বলতে চেষ্টা করল, বলতে পারল না। লীলাবতী বললেন। বললেন, 'গিয়ে এক্ষুনি বাছা আমার কাজ করতে পারবে না। ছুটি বাড়িয়ে নিতে হবে।'

লীলাবতীর ওই 'বাছা আমার' কথাটা মৃণালের কানে একটা অনিয়মের মতো লাগল। জ্যোতি নেই, অথচ মৃণালের মূল্য রয়েছে, এ হতে পারে না।

ভক্তিভূষণ বললেন, 'এমনিতেই তো পাওনা ছুটি ছিল না।'

লীলাবতী বললেন, 'তা হোক। অবস্থা বুঝিয়ে দরখাস্ত করতে হবে।'

'অবস্থা বুঝিয়ে!'

ভক্তিভূষণ একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কোন্ অবস্থাটা বোঝাবে তুমি?'

লীলাবতী মাথা হেঁট করলেন। তাইতো বটে! কোন্ অবস্থাটা বোঝাবেন?

জ্যোতি যদি এখানে এসে হঠাৎ একদিনের অসুখে মারা যেত, তাহলে অনেক শান্তি ছিল। সে কথা চেঁচিয়ে বলা যেত। সে শোকের ভাগ অপরকে দেওয়া যেত। অবস্থা বোঝানো যেত।

জ্যোতির মা-বাপ নেই, তবু দাদা-বৌদি আছে, তাদের কাছে কী বলা হবে?

ওই কথাই বলতে হবে। ভাবলেন, আর তারপরই হঠাৎ মনে হলো লীলাবতীর, বাড়িটা আবার তন্ন তন্ন করে খোঁজা দরকার।

যদি পরে এসে কোথাও লুকিয়ে বসে থাকে। যদি লজ্জায় মুখ দেখাতে না পারে?

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন। ভক্তিভূষণ বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'ছাতের সিঁড়িটা আর একবার খুঁজে আসি।'

'পাগলামী করছ কেন?' বলল মৃণাল।

লীলাবতী বললেন, 'যদি কোনো এক ফাঁকে এসে সেখানে গিয়ে বসে থাকে! যদি লজ্জায়—'

লীলাবতীর গলাটা আর স্বাভাবিক ছিল না, খ্যাঁসখেঁসে ভাঙা ভাঙা সেই কণ্ঠস্বরটা কিন্তু সহসা মৃণালের কানে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো বয়ে গেল।

ঠিক, ঠিক তো! একথা তো আমারই ভাবা উচিত ছিল।

এই প্রকাণ্ড বাড়িটার পাঁজরের খাঁজে খাঁজে কত ফোকর, মৃণাল তো জানে না সব।

অবশ্য দেখা হয়েছে সেই খাঁজে খাঁজে চোখ ফেলে, কিন্তু সে তো একবার! যদি তারপরে এসে থাকে? মা'র সঙ্গে উঠে গেল মৃণাল।

ভক্তিভূষণ বললেন, 'টর্চটা নিয়ে যাও।'

মৃণাল তারপর মা'র আগে আগে চলল। সিঁড়িটা দেখে এল। আরো কত জায়গা দেখল।

তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন লীলাবতী, 'গোয়ালটা দেখা হয়নি।'

'গোয়াল !'

মৃণাল অবাক হয়ে তাকাল। ভাবটা এই, গরু কোথায় যে গোয়াল ? কিন্তু আছে সেটা।

লীলাবতী বললেন, 'গরু নেই বলেই ভাবছি যদি মানুষ এসে আশ্রয় নিয়ে থাকে—' কথা শেষ করতে পারলেন না।

একই তাপে তাপিত দু'টো মানুষ পরস্পরকে বুঝতে পারছে, অথচ প্রাণ খুলতে পারছে না। প্রাণের সেই খোলা দরজাটায় আগল লাগিয়ে রেখে গেছে জ্যোতি নামের একটি প্রাণ-কণিকা।

ওবা রান্নাঘরের পিছনের দরজা খুলল।

বহুদিনের অব্যবহার্য গরুহীন গোয়ালের দিকে চলে গেল।

ভক্তিভূষণ গেলেন না। ভক্তিভূষণ কাল থেকে সহস্রবার দেখেছেন এই বাড়ির চারিদিক। চাল-ভেঙে-পড়া ওই গোয়ালটাই শুধু দেখেননি বলেই কি সেইখানে পাওয়া যাবে জ্যোতিকে ?

ভক্তিভূষণ উঠলেন না।

ভক্তিভূষণ দেখলেন উঠোনের ওধার দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা।

তারপরই, পরক্ষণেই একটা তীব্র চিৎকার শুনতে পেলেন ভক্তিভূষণ।

মৃণালের গলা। ভক্তিভূষণকেই ডেকে উঠেছে।

শুধু বলে উঠেছে, 'বাবা !'

ডাক, না আর্তনাদ ? ভক্তিভূষণের ভাগ্যে কি এবার গোখরো বেরুলো ? পোড়ো গোয়ালের কোনো গহ্বর থেকে ?

তাই। তাছাড়া আর কিছু নয়।

প্রস্তুত হয়েই এগিয়ে যান ভক্তিভূষণ।

শুধু ভাবতে ভাবতে যান, কাকে শুয়ে পড়ে থাকতে দেখবেন ?

মৃণালকে, না লীলাবতীকে ?

কিন্তু মৃণাল নয়, লীলাবতী নয়। অথচ আছে শুয়ে একজন ভাঙা গোয়ালের ভিজে কাঠ-বাঁশের স্তূপের ওপর। শাড়ির নীচের দিকটা কাদায় কালো, বাকি সমস্তটা কাদার ছিটেয় আরো ক্লেদাক্ত।

ভক্তিভূষণও চেঁচিয়ে উঠলেন। বলে উঠলেন, 'ও কে ? ও কে ?'

যেন জিজ্ঞেস করলেন।

॥ ৯ ॥

কিন্তু যাদের জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি জানে ও কে ?

তারা বেড়ার ফাঁক থেকে শাড়ির চিহ্ন দেখে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়েছিল, তারপর মৃণাল আর্তনাদ করে উঠেছিল, 'বাবা !'

আর ভক্তিভূষণ বললেন, 'ও কে ? ও কে ?'

লীলাবতী ভাঙা গলায় বললেন, 'টর্চটা আর একবার ধর বাবা, দেখি আমার বৌমা কিনা !'

কিন্তু মৃণাল টর্চ ধরল না। মৃণাল একটা নোনাধরা দেওয়ালের ভিজে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লীলাবতী তাকিয়ে দেখলেন না কোথায় বসছেন, বসে পড়ে হতাশ গলায় বললেন, 'ভগবান কি আমাদের ছলনা করছেন ?'

এ প্রশ্নই বা কাকে করছেন তিনি ? এখানে কি উত্তর আছে ?

এখানে তো শুধু ভয়ঙ্কর একটা নিরুত্তর প্রশ্ন মাথা কুটে মরছে।

ও কে ? ও কোথা থেকে এল ? ওকে নিয়ে এখন কী করব আমরা ? ও কি বেঁচে আছে ? ঈশ্বর কি ছলনা করছেন ?

অনেকক্ষণ পরে সেই ভয়ঙ্কর প্রশ্নটা করলেন ভক্তিভূষণ, 'ওর কি প্রাণ আছে ?'

প্রশ্ন। প্রশ্নই শুধু।

কে দেখবে সাহস করে ওর প্রাণ আছে কিনা? ও কি জ্যোতি? ও কি এ বাড়ির সেই প্রাণপুতুলটি? তাই ওকে দেখামাত্র এ-বাড়ির ছেলে ওকে বুকে তুলে নিয়ে চলে আসবে? ওর ওই অসাড় দেহে প্রাণ আছে কি না দেখবে, প্রাণ আনবার চেষ্টায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠবে? আর এ-বাড়ির আর দু'জন সদস্য তাদের সবখানি আকুলতা দিয়ে ওর গায়ে হাত বুলোবে, ওর মাথায় বাতাস করবে, আর ডাকবে 'বৌমা! বৌমা!'

ও জ্যোতি নয়, ও আর-একটা মেয়ে।

তবু নিরুপায় হয়েই ওকে তুলে আনতে হলো। এ-বাড়ির ছেলেকেই বয়ে আনতে হলো। যে নাকি শাড়ির একাংশ দেখে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়েছিল, চিৎকার করে উঠেছিল, আর তারপর পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আর কে আনবে? আর কার সে শক্তি আছে?

যে শক্তিটুকু ছিল, তারও তো আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

মৃণালেরই কি ছিল? তবু মৃণালকেই করতে হবে।

যৌবনের একটা দায়িত্ব আছে। 'পারছি না' শব্দটা তার জন্যে নয়।

॥ ১০ ॥

'প্রাণ নেই!' দালানে এনে শুইয়ে দেবার পর ভাবশূন্য গলায় উচ্চারণ করলেন লীলাবতী। 'প্রাণ নেই!'

তার মানে ভয়ঙ্কর এক বিপদের উপর আরো ভয়ঙ্কর এক বিপদ এসে চাপল।

কী করবেন এখন ওই মৃতদেহটা নিয়ে?

কাল ভোরের গাড়িতে রওনা দেবার কথা।

যুদ্ধে আহত পরাজিত সৈনিকের মতো, ঝড়ে আহত ডানাভাঙা পাখীর মতো, সেই দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাটে গিয়ে পড়বেন, আর জ্যোতিকে খোঁজা খোঁজা খেলা করবেন, এর বেশী তো আর কিছু ভাবেননি।

তাতে বিশ্রামের আশ্বাস ছিল। তাতে শুধু ধূসর শূন্যতার স্বাদ ছিল।

কিন্তু এ কী? এ কে?

এ কেন মৃণালদের এই ভাঙা ভিটেয় মরে পড়ে থাকতে এল?

কী রহস্য আছে এর অন্তরালে?

'মা, একটু গরম জল দিতে পারবে?' আস্তে বলল মৃণাল।

'দাও' বলতে বাধল। বলল, 'দিতে পারবে?'

দেখতে পাচ্ছে, লীলাবতীর হ্যারিকেন ধরা হাতটা কাঁপছে!

ভক্তিভূষণ কপালে একটা আঙুল ঠেকালেন। বললেন, 'কী হবে? অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।'

মৃণাল হাত তুলে নিষেধের মতো ভঙ্গী করল। ইসারায় বলল, এখনই ওকথা নয়। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'মা, একটা শুকনো কাপড় পরিয়ে দিতে পারবে?'

লীলাবতী অস্ফুটে বললেন, 'আছে?'

'মনে হচ্ছে।'

'কাপড় আনছি।' দ্রুত চলে গেলেন।

হঠাৎ হাতে-পায়ে ব্যস্ততা এল লীলাবতীর। ওই দেহটা যে একটা মৃতদেহ নয়, এই আশ্বাস পেয়ে ভয়ানক একটা স্বস্তি বোধ করলেন। কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন—করলেন ঈশ্বরের কাছে, মৃণালের কাছে, ওই মেয়েটার কাছে।

মুহূর্তে স্টোভ জ্বেলে জল বসিয়ে নিজের একটা শাড়ি আর সেমিজ নিয়ে এলেন, মৃণাল সরে এল। ভক্তিভূষণকে সরে আসতে দিলেন না, বললেন, 'মাথাটা একটু ধর তুমি, আমার নাড়াচাড়া করতে ভয় করছে।'

বললেন, 'ওর কি কোনো সাড় আছে যে লজ্জা?' তারপর কি ভেবে বললেন, 'তোমারই বা লজ্জা কিসের? মেয়ের মতো। বৌমার বয়সীই হবে'—

যেন অসতর্কে ওই নিষিদ্ধ নামটা উচ্চারণ করে ফেললেন। টাল সামলাতে পারলেন না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। সাবধানে ওকে ভিজে জামা-কাপড় ছাড়িয়ে শুকনো কাপড়-জামা পরিয়ে দিলেন। অনুভব করতে পারলেন প্রাণ আছে!

বিপদের পাহাড়টা সমতল মনে হচ্ছে। আর একটা যে পাহাড় আগে থেকে দাঁড়িয়ে ছিল, এই স্বস্তির হাওয়ায় সেটাও যেন হালকা হয়ে গেল।

যেন একটি মাত্রই সমস্যা ছিল সংসারে, সে হচ্ছে এই দেহটা। যদি মৃতদেহ হয়, কী হবে সেটা নিয়ে?

সেই সমস্যাটা চলে গেল। অতএব পাহাড়টা নেমে গেল।

পরে ও বাঁচবে কিনা সেটা পরে ভাবলেও চলবে। এখন তো আছে বেঁচে। বেঁচে আছে, বুকটা ওঠা-পড়া করছে। কাদামাখা ভিজে কাপড়-ব্লাউজ থেকে বোঝা যাচ্ছিল না, শুকনো কাপড় পরানোর পর বোঝা যাচ্ছে সেই ওঠা-পড়া।

মৃদু, মন্থর, অনিয়মিত। তবু চলছে কাজ।

॥ ১১ ॥

চিকিৎসার মধ্যে গরম জলে ধুইয়ে দিয়ে শুকনো কাপড়ের সেঁক, ওষুধের মধ্যে ভক্তিভূষণের নিত্যবরাদ্দ মকরধ্বজের একমাত্রা। ব্যবস্থার মধ্যে মোটা তোষকের বিছানায় শুইয়ে দেওয়া।

তবু তাই কি কম?

রাস্তায় পড়ে মরবার মতো ভাগ্য নিয়ে যারা মৃত্যুপথে যাত্রা করে, তাদের পক্ষে ওই যথেষ্ট, ওই পরম চিকিৎসা। ওতেই মৃত্যু-

পথযাত্রিণীকে টেনে নিয়ে আসা যাচ্ছে জীবনের আলোকোজ্জ্বল কক্ষের দিকে।

কিন্তু এদের তাতে আহ্লাদ কেন? ওর নিথর দেহে জীবনের স্পন্দন দেখা যাচ্ছে দেখে লীলাবতী আগ্রহে ঝুঁকে পড়ছেন কেন? কেন বার বার এসে খাটের ধারে দাঁড়াচ্ছে লীলাবতীর ছেলে?

আর লীলাবতীর স্বামী পাঁচ মিনিট অন্তর ওর নাড়িটা দেখে যাচ্ছেন কেন? ও যে ওর মৃতদেহটা নিয়ে এসে ফেলে দেয়নি, এই কৃতজ্ঞতাতেই কি ওকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে?

'এমনি করে যদি বৌমাকে পাওয়া যেত!'

ফিসফিস করে বললেন লীলাবতী।

কাউকে শোনাতে নয়, নিজেকেই শোনাতে শুধু।

'মনে হচ্ছে বুঝি বৌমাই এসেছে!'

ফিসফিস করেও নয়, মনে মনে।

'হায় ভগবান, তাকে যদি এনে দিতে এমনি করে!'

॥ ১২ ॥

এ ঘরটা লীলাবতীর সেই ফুলশয্যার ঘর। এ পালঙ্কটা সেই উঁচু-পায়া পুরনো পালঙ্ক। এর ওপরেই শুইয়ে দেওয়া হয়েছে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটাকে। কারণ এমনি একটু আরামের দরকার ছিল ওর।

কিন্তু শুধুই কি ওর দরকার ছিল বলে?

ও যদি বাসনমাজা-ঝি গোপালের মা'র সমগোত্র হতো? লীলাবতীর পালঙ্কের ওপর পুরু তোষক পাতা বিছানায় তুলে শুইয়ে দিত লীলাবতীর ছেলে?

বার বার এসে দাঁড়াত ওই পালঙ্কের ধারে?

দাঁড়াত না, দিত না। দিয়েছে ও মৃণালদেরই সমগোত্র বলে।

ওর মুখের রেখায়, ওর দেহের গঠন-ভঙ্গীতে, ওর সাজ-সজ্জায় সেই কথাই ঘোষিত হচ্ছে।

ওর নিমীলিত চোখের পাতা দুটো মৌনতার আবরণে নিজেকে ঢেকে রেখে দিয়েছে, তবু যেন বলে উঠতে চাইছে, 'আমি তোমাদেরই লোক'।

'তুই আর কত জাগবি, শুয়ে পড়গে যা।'

কাল থেকে আজকের এই রাত পর্যন্ত এই এখন প্রথম ছেলের সঙ্গে একটা সহজ কথা কইলেন লীলাবতী।

মৃণালও সহজ কথা কইল। সে-ও বোধহয় এই প্রথম। বলল, 'তার থেকে বাবারই শুয়ে পড়া উচিত। বাবার একটু ঘুমের দরকার।'

'না না, আমি ঠিক আছি।' বললেন ভক্তিভূষণ।

কিন্তু আর বার দুই অনুরোধ করতেই গিয়ে শুয়েও পড়লেন।

পাশের ঘরে। যে ঘরে ভক্তিভূষণের অকৃতদার জ্যাঠতুতো দাদা বরাবর শুয়ে এসেছেন একটা সরু চৌকিতে।

শুয়ে পড়ে প্রথম মনে হলো তাঁর, কাল থেকে শুধু এক পেয়ালা চা ছাড়া আর কিছু খাননি।

॥ ১৩ ॥

লীলাবতী ছেলেকেও শুয়ে পড়বার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন, বলেছিলেন, 'আমি ঠিক খাড়া থাকব', কিন্তু ঢুলতে লাগলেন। বার বার সামলে নিতে থাকেন, আর মনে পড়তে থাকে, পরশু থেকে কিছু খাওয়া হয়নি।

দিনের বেলা কখন যেন ভক্তিভূষণ একবার বলেছিলেন আস্তে উদাসী গলায়, 'একটু চা খেলে—'

একটু চা খেলে কী হতো, তা আর বলতে পারেননি। লীলাবতী

ডুকরে উঠেছিলেন, 'বৌমার হাতের সাজানো চায়ের সাজ, হাতে করে নড়চড় করতে পারব না গো আমি! সে যে কত শখ করে নতুন সেট কিনেছিল এখানে আনবে বলে—'

ভক্তিভূষণ অপ্রতিভ হয়েছিলেন। 'থাক থাক', বলে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

মনে পড়েছিল তাঁর, সত্যিই বটে কিনে এনেছিল জ্যোতি কিছু কাঁচের বাসনপত্র।

ভক্তিভূষণ বলেছিলেন, 'বাড়িতে এত কাপ-ডিশ-গেলাস, আবার কিনে আনলে বৌমা?'

জ্যোতি হেসে হেসে বলেছিল, 'এ আমার গাঁইয়া শ্বশুরবাড়ির জন্যে বাবা! দেখছেন না কেমন মোটা মোটা, গাঁইয়া! ওখানে রেখে আসব।'…

এখানে এসে মহোৎসাহে তার দিদিশাশুড়ীর ভাঁড়ারের তাক ঝেড়ে পুরনো খবরের কাগজ পেতে সাজিয়ে ফেলেছিল সেইসব সরঞ্জাম। পাশে পাশে সাজিয়েছিল চিনির বোতল, চায়ের কৌটা, কনডেন্সড্ মিল্ক, ভক্তিভূষণের হরলিকস্।

ভক্তিভূষণ হেসে হেসে বলেছিলেন, 'মা জননী কি এখানেই বসবাস করবে ঠিক করেছ নাকি? দু'চার দিনের জন্যে—'

জ্যোতি আলো আলো মুখে বলেছিল, 'বাঃ, তা বলে গাছতলায় থাকার মতো থাকতে হবে নাকি? দু'চারদিনই ভালভাবে থাকব। ভাল করে সাজিয়ে থাকব।'

সেদিন বিকেলে চায়ের পাট সেরে ভালভাবে সাজিয়ে রেখেছিল। সব পরিপাটি করে। লীলাবতী তবু সেই সব নিয়েই চা বানিয়েছিলেন।

আজ ঢুলতে ঢুলতে বার বার ভাবলেন, কাল সকালে উঠে চা একটু করতেই হবে ভাল করে। ছেলেটার কষ্ট হচ্ছে। উনি বুড়োমানুষ!

ভাবলেন, কাল সকালের গাড়িতে তো যাওয়া হচ্ছে না বোঝাই যাচ্ছে।

এখন এই ঘাড়ে-এসে-পড়া মেয়েটাকে অন্যায়কারী বলে মনে হলো।

আর জায়গা পেলি না তুই?

আমার এই বিপদ, এই হাহাকারের ওপর বিপদ বাড়াতে এলি!

এখানে কি তেমন হাসপাতালই আছে ছাই যে, তোকে ভর্তি করে দিয়ে চলে যাব? অতএব যতদিন না তুই উঠে দাঁড়াতে পারছিস, তোকে গলায় গেঁথে মরতে হবে আমাদের!

উঃ, কী শাস্তি! কী শাস্তি!

কার মুখ দেখে কলকাতা থেকে পা বাড়িয়েছিলাম!

মনে হচ্ছিল কলকাতায় ফিরে গেলেই বুঝি সব সুরাহা হবে। কলকাতার থানা পুলিস কিছু একটা করবে।

কিন্তু এখন কলকাতাটা দূরে সরে যাচ্ছে।

এই মেয়েটা অন্যায় করে সুযোগ নিতে এসেছে।

বৌমাকে হারিয়ে এ কাকে আমি খাট-বিছানায় শুইয়ে তোয়াজ করছি!

মরতে আমি আবার গেলাম গোয়ালের দিকে—হঠাৎ শিউরে উঠলেন লীলাবতী। ভাবলেন, ইস্! যদি না যেতাম!

॥ ১৪ ॥

হ্যারিকেন লণ্ঠনের মৃদু শিখা বাতাসে কাঁপছিল, ঘরটা ছায়াচ্ছন্ন।

লীলাবতী খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে বসে ঢুলছেন। মৃণাল ঢুলছে প্রকাণ্ড পিঠওয়ালা ভারী কাঠের একটা সাবেকী চেয়ারে বসে।

নড়তে চড়তে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ হচ্ছে, তবু বসা যায়। বিশ বছর ফেলে রেখে চলে যাওয়ার অপরাধে অভিমানে খানখান হয়নি।

শব্দটা বরং উপকারী। জেগে থাকতে সাহায্য করছে।

মাঝে মাঝেই টর্চ জ্বেলে দেখতে হচ্ছে কিনা, চোখের পাতা দুটো হঠাৎ খুলে পড়ে দেখতে চাইছে কিনা কোথায় আছে! অথবা হঠাৎ বুকের সেই ওঠা-পড়াটুকু থেমে গিয়ে সবটা স্থির হয়ে গিয়েছে কিনা।

তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনায় ভাবতে ইচ্ছে করছে, বিছানায় শুয়ে আছে জ্যোতি। ওকে পাওয়া গেছে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছিটকে কোথায় চলে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে। ফিরে আসতে বৃষ্টিতে ভিজেছে, কষ্ট পেয়েছে, অজ্ঞান হয়ে গেছে।

যাবেই তো। মানুষটা যে বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে সুকুমার, সবচেয়ে আদরের, আর সবচেয়ে ছোট্ট। অত কষ্ট সহ্য হয় ওর?

রাত্রের অন্ধকারে বিভ্রান্ত হয়েছি আমরা, তাই ভাবছি ও আর-কেউ। সকালের আলোয় যখন সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে, দেখব ও জ্যোতি হয়ে গেছে। চোখ খুলে তাকিয়ে বলছে, 'জল খাবো।'

ভাবতে ইচ্ছে করছে। ভাবতে ভাল লাগছে।

ঘুম আর জাগা, স্বপ্ন আর সত্যির দোলায় দুলতে দুলতে রাতটা কেটে গেল মৃণালের, আস্তে আস্তে।

ট্রেন ধরতে যাবার প্রশ্ন আজ আর নেই, অতএব এই সময় একটু ঘুমিয়ে নিলে কেমন হয়? জ্যোতি ততক্ষণে সত্য হয়ে উঠুক। উঠে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল জ্যোতির বালিশে মুখ চেপে। যে বিছানা জ্যোতি পেতে রেখে গিয়েছে।

॥ ১৫ ॥

এখনো তো কোনো সাড়া দেখছি না—ভাবলেন লীলাবতী ভোরের আলোর দিকে তাকিয়ে, এই অবসরে চানটা করে এসে একটু চা তৈরি

করি। আজ দুটো ভাতে-ভাতও ফুটিয়ে নিতেই হবে, একজনকে হারিয়ে ফেলেছি বলে কি অবহেলা করে। স্বামী-পুত্তুরকেও হারাব?

উঠলেন মনের জোর করে। যেন ওই-একটা মৃতকল্প মেয়ে জোরটার জোগান দিল।

উঠেই দেখলেন, উঠোনের বেড়ার দরজা ঠেলে গোপালের মা ঢুকছে।

লীলাবতী যেন বসে পড়লেন। লীলাবতীর মনে হলো, সবাই সব জেনে ফেলেছে।

জেনে ফেলেছে, ক'দিনের জন্যে আমোদ করতে এসে ভক্তিভূষণ ঘোষের সংসারটা মুখে কলঙ্কের কালি মেখেছে, যথাসর্বস্ব হারিয়েছে।

এবার ধিক্কার দেবে সবাই।

বলবে, ছি ছি! এই মুরোদ তোমাদের? দেশের বাড়িতে বেড়াতে এসে পাড়ার লোকের কান ফুটো করে গ্রামোফোন বাজিয়ে গান শুনছিলে না? বড় বড় মাছ কিনে এনে খাচ্ছিলে না? হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি?

গ্রামের দীনহীন জ্ঞাতিদের দিকে করুণার সৌজন্যে তাকিয়ে বলছিলে না—'ভাল তো? এই এলাম ক'দিন বেড়িয়ে যেতে। বৌমার ইচ্ছে—'

এখন?

এখন যদি আমরা বলি, কোথায় গো তোমার সেই বৌমা?

গোপালের মাকে দেখে লীলাবতী দিশেহারা হলেন।

গোপালের মাকে দেখে পায়ের তলায় মাটি হারালেন।

কিন্তু গোপালের মা পাড়ার লোকের প্রতিনিধি হয়ে আসেনি। গোপালের মা পরশু রাতের সেই ভয়াবহতার বর্ণনা নিয়ে এসে আছড়ে পড়েছে।

'জানে-প্রাণে আছ মা তাহলে তোমরা? আমি বলি বুঝি

ভয়-তরাসে চলেই গেছ। কী কাণ্ড মা, কী কাণ্ড! পরশু রাত থেকে ঘুম নেই খাওয়া নেই মা, কেবল বিভীষিকা দেখছি!'

একসঙ্গে ঝুড়ি ঝুড়ি কথা বলে যায় গোপালের মা। সেদিনের হামলায় কার কার কী কী ক্ষতি হয়েছে তার বিশদ বর্ণনা করে, আর থেকে থেকেই কপাল চাপড়ে বলে, 'তোমরা তো দিব্যি কলকেতায় বসে আছ মা, টের পাও না কিছু। আমরা এই পাপ নিয়ে ঘর করছি। সংসার করছি, না যমের মুখে পড়ে আছি!' হতাশায় ভেঙে পড়ে বলে, 'থেকে থেকে একবার করে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে, তোল মাটি ঘোল করে, গরু-বাছুর আর রাখে না কারুর। সাত ট্যাকা দিয়ে বক্‌না বাছুরটা কিনলাম ও-মাসে, সেটাকে টেনে নে গেল মা! গরীবের সর্বনাশ করাল যারা, তাদের ভাল হবে? যমে নেবে না তাদের? হাত পা খসে যাবে না? দু'চক্ষু অন্ধ হয়ে যাবে না?'

গোপালের মা কান্নায় উচ্ছ্বসিত—'তার ওপর মুখপোড়া আকাশ যেন ভেঙে এসে মাথায় পড়ল! কোথাকার মানুষ কোথায়, কোথাকার বস্তু কোথায়, চোখে-কানে আঁধার!'

এতক্ষণে লীলাবতী একটা কথা বললেন। বললেন, 'তবু তো আগুনগুলো নিভলো। মশাল নিয়ে তচনচ্ করছিল।'

'তা বলেছ হক কথা!'

গোপালের মা বলে, 'দু'দিন আর আসতে পারিনি মা! আজ বলি যাই দেখে আসি, মা রইল না চলে গেল।'

পরিচিত জায়গা থেকে ঝাঁটাগাছটা বার করে জুৎ করে ঠুকতে থাকে গোপালের মা প্রস্তুতি হিসেবে।

লীলাবতী ভয় পান। গোপালের মাকে তাড়াতে চেষ্টা করেন।

লীলাবতী বলেন, 'থাক থাক গোপালের মা, আজ তোমার মন ভাল নেই, আজ আর কিছু কবতে হবে না।'

গোপালের মা এ করুণা গ্রহণ করে না। বলে, 'এসেছি যখন, সাফ করে দিয়ে যাই।'

প্রতি দিন নগদ একটাকা হিসেবে পারিশ্রমিক দিচ্ছেন লীলাবতী, এ কাজকে অবহেলা করা যায় না।

উঠোনে ঝাড়ু দিতে দিতে বক বক করেই চলে গোপালের মা, 'ভেবেছিলাম তোমার কাছ থেকে পাওয়া ট্যাকাটা দিয়ে আর একটা 'নই' বাছুর কিনব, তা মূলে হাবাত হলো! কপাল! দুঃখীর কপাল!'

লীলাবতী ওই ক্ষুব্ধ আশাহত প্রৌঢ় মুখটার দিকে তাকিয়ে আস্তে বলেন, 'কত টাকা লাগে?'

গোপালের মা চমকে মুখ তুলে তাকায়। বলে, 'মায়ের কি শরীর ভাল নেই?'

লীলাবতী গোঁজামিল করেন। বলেন, 'না, ভালই তো আছে। মানে একটু খারাপ হয়েছে।'

'না বাপু, একটু না, চোখ-মুখ বসে গেছে মনে হচ্ছে। সুখী শরীর তোমাদের, পাড়াগাঁয়ে কি সয় গো? বাছুরের কথা বলছ? 'নই' বাছুর একটা ষোল ট্যাকার কম নয়। তা সে আর এখন ভাবা মিথ্যে। সবাইয়ের সব ঘুচলো, কে বেচবে?'

লীলাবতী ওর শূন্যতার দিকে তাকিয়ে দেখেন। ওর ওই শূন্যতা দূর করার ক্ষমতা লীলাবতীর হাতে রয়েছে। ষোলটা টাকা লীলাবতীর কাছে এমন কিছু নয়, ওর কাছে অনেক। লীলাবতী দেবেন ওকে।

দু'দিন আগে হলে এমন দিলদরিয়া ভাবনা ভাবতে বসতেন না লীলাবতী, আজ ভাবলেন। বললেন, 'তা হোক, পরে কিনো। দেব আজ টাকাটা।'

গোপালের মা'র অবশ্য প্রস্তাবটা বুঝতে অনেক সময় গেল, তারপর বিগলিত হয়ে পায়ে পড়ে প্রণাম করল, সহস্র শুভ-কামনা

করল, স্বামী-পুত্তুর নিয়ে সোনার সংসার করার প্রার্থনা জানাল তারপর বলল, 'বাসন দেখছি না মা ! রাতে রাঁধনি ?'

লীলাবতী মাথা নাড়লেন।

'তাই বলছি, মায়ের শরীর ভাল দেখছি না। তা' বৌদি পারে না রাঁধতে ?'

লীলাবতীর পায়ের নীচের মাটি সরে গেল।

লীলাবতী হঠাৎ ঘরের মধ্যে কার যেন ডাক শোনার ভঙ্গীতে 'যাই' বলে শিথিল ভঙ্গীতে ভিতরে ঢুকে গেলেন।

লীলাবতী খেয়াল করলেন না, গোপালের মা-ও আসবে পিছন পিছন।

আসবে, ঘর পরিষ্কার করাও কর্তব্য ওর। তাছাড়া আজ যে প্রস্তাব দিয়েছেন লীলাবতী, আজ তো ও পায়ে পায়ে ঘুরবে।

লীলাবতী দেখলেন তাঁর ঘরের দরজায় মৃণাল দাঁড়িয়ে, তাঁর ঘরের ভিতর ভক্তিভূষণ। ওরা বুঝতে পারছে না, দরজাটা বন্ধ করে দেবে কিনা।

বুঝতে পারছে না ঝিটাকে ধমক দিয়ে ভাগাবে কিনা।

লীলাবতীকে দেখে ভয়ঙ্কর একটা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল ওরা। আর ঠিক সেই মহামুহূর্তে সেই ভয়ানক কথাটা বলে উঠল গোপালের মা। লীলাবতীর পিছু পিছু চলে এসেছিল সে ঘরের দরজা অবধি।

॥ ১৬ ॥

ওই ভয়ানক কথাটা যেন ভয়ানক একটা বিদ্যুতের ধাক্কা দিয়ে গেল ওদের। ওই ভয়ানক কথাটা যেন অগাধ সমুদ্রে একটা ভেলা এগিয়ে দিল। ওরা যেন হাতে স্বর্গ পেল। ওরা বুদ্ধিবৃত্তি হারাল।

তিনটে মানুষ পরস্পরের দিকে তাকাল, আর সেই ভেলায় চড়ে বসল।

তাই একই প্রশ্নে তিনজনে।মাথা হেলাল, তিনজনের নিজস্ব ভঙ্গীতে।

গোপালের মা ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে বলে উঠেছিল, 'ওমা, বৌদিদির বুঝি অসুখ ?'

ওরা তিনজনে মাথা হেলিয়ে জানাল, 'হ্যাঁ।'

কারণ ওরা দেখতে পাচ্ছিল, বাইরে থেকে শয্যাগতার চাদর ঢাকা দেওয়া পায়ের দিকটা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

গোপালের মা বিবেচনা দেখাল। বলল, 'ঘুমচ্ছে বুঝি ? জ্বর বেশী ?···তবে থাক, এখন আর ওঘরে ঢুকে কাজ নেই। পরে সাফ হবে।'

নেমে গেল দালান থেকে, বলতে বলতে গেল, 'তাই বলি মায়ের মুখটা শুকনো কেন! ভাবনা কোরনি মা, সে রাত্তিরের জলে ঘরে ঘরে সর্দি কাশি জ্বর।···উনুনটায় আগুন দিই মা ?'

লীলাবতী আর ওকে ওদিকে এগিয়ে যাবার সুযোগ দেবেন না। দেবেন না সন্দেহ করবার সুযোগ। বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'দাও।'

'ভয় কোর না মা, ভাল হয়ে যাবে।' তারপর এদিক-ওদিক খানিক কাজ করে এসে হঠাৎ এগিয়ে এল লীলাবতীর কাছে।

কেউ নেই, তবু এদিক-ওদিক তাকাল। কারণ নেই, তবু গলার স্বর নামাল। তারপর বলল, 'আর এক ঘটনা শুনেছ মা ?'

লীলাবতী পাথরের চোখে তাকিয়ে রইলেন।

ও সে চোখ দেখল না। ও ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, 'সরকারী ইস্কুলের দিদিমণিকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না সেই রাত থেকে।'

লীলাবতীর গলা থেকে কিছু একটু শব্দ বার হলো।···

লীলাবতীর সংবাদদাতা আরো গলা নামায়, 'সবাই বলছে, সন্দ'র আর কিছু নেই, নিয্যস লুঠ করে নিয়ে গেছে! সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত দেখেছে লোকে, তারপর হাওয়া! যাবে কোথায় ?

এই ক'দিন হলো এসেছিল গো! কারুর সঙ্গে চেনা-জানা হয়নি এখনো। কে জানে কোথায় ঘরবাড়ি! তবে তোকেও বলি, কাঁচা বয়েস, একা তোর বিদেশে-বিভুঁয়ে আসা কেন? মাঠের মাঝখানে টিনের চালার ইস্কুল, কে রক্ষে করে তোকে?'

'পুলিসে কিছু করবে না?'

শ্রান্ত গলার একটা ঢিলে প্রশ্ন যেন ওই কথার স্রোতটায় বাঁধ দিতে চাইল।

তা বাঁধ পড়ল।

গোপালের মা জিভে একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ করে বলল, 'পুলিস! হুঁ!'

আর কথা বলল না, জোরে জোরে ঝাঁটাতে লাগল। যেন ওই 'পুলিস' শব্দটার উপরই ঝাঁটাটা চালাতে লাগল।

॥ ১৭ ॥

ধীরে ধীরে চেতনা ফিরছে।

মৃত্যুর হিমশীতল থাবার ভিতর থেকে জীবনের সাড়া আসছে।

বুকের স্পন্দন দ্রুত হচ্ছে, শৃঙ্খলার ছন্দ দেখা যাচ্ছে তাতে।

কপালের উপর একটা মাছি বসল, ভুরুটা কোঁচকালো। তার মানে অনুভূতি ফিরছে।···হয়তো আর একটু পরেই ওই গালের উপর লেপটে থাকা চোখের পলকগুলো গাল থেকে উঠে পড়বে।

বিহ্বল দৃষ্টি মেলে একবার চারিদিক দেখে আবার চোখটা বুজবে। তারপরে আস্তে আস্তে ভাবতে থাকবে, এরা কারা? আমি এখানে কেন?

তারপর উঠে বসবে। তারপর ট্রেনে উঠতে যেতে পারবে।

কিন্তু ওই ঘাড়ে-এসে-পড়া বিপদটাকে বহন করে নিয়ে যেতে চায় কেন এরা?

ওরা তো ওই সরকারী ইস্কুলটায় খোঁজ নিতে পারত! ওরা তো হাসপাতালের সন্ধান করতে পারত!

তা করছে না ওরা। কারণ ওরা কাঠের ভেলায় পা রেখেছে।

ওরা আপাত চিন্তাকে বড় করে তুলছে। ওরা দেখছে মানুষ আর প্রকৃতিতে মিলে যে দুর্দশা ঘটিয়েছে লোকের, তাই নিয়েই ব্যস্ত তারা। ঘোষেদের পুরনো বাড়িতে যারা ক'দিনের জন্যে বড়মানুষী দেখাতে এসেছিল, তাদের খোঁজ নিতে আসার গরজ কারো নেই।

এই ফাঁকে সরে পড়তে হবে।

গরজ হবার আগে, কেউ এসে উঁকি দেবার আগে।

তবে এটাই ভাল। চার জন এসেছিল ঘোষেরা, চার জনই চলে গেল। বৌ অসুস্থ, শুইয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে তাকে।

বৌয়ের শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামী যদি তার মুখের কাছে ঝুঁকে থাকে, কে আর উঁকি দিয়ে সেই মুখ তল্লাস করতে আসবে?

কলকাতায় গিয়ে? সে তখন বোঝা যাবে।

কিন্তু ও উঠে দাঁড়াতে পারলে তবে তো! বারো-তেরো ঘণ্টা হয়ে গেল, চোখই খুলছে না।

চোখ খুলছে না, তাই ওর দিকে চোখ মেলে বসে থাকা সম্ভব হচ্ছে।

আর সম্ভব হচ্ছে বলেই ধরা পড়ছে, ওর চোখে চশমা না থাকলেও নাকে চশমা পরার খাঁজ, ওর হাতে ঘড়ি না থাকলেও মণিবন্ধে ঘড়ির ব্যাণ্ডের দাগ।

তার মানে ঘড়ি আর চশমা খুইয়েছে।

কিন্তু শুধুই কি ঘড়ি-চশমা? আর কিছু খোওয়া যায়নি?

কে বলবে? ওর যখন জ্ঞান হবে, ও কি বলবে সে-কথা?

হয়তো জ্ঞান হলে ও বিরক্ত হবে। ওই মাছি বসার ভুরুর মতো ভুরুটা কুঁচকে বলবে, 'কে বলেছিল আমাকে তুলে আনতে?'

বলবে, 'কী আশ্চর্য, এত কৌতূহল!'···বলবে, 'আমি আপনাদের সঙ্গে যাব মানে?'

হয়তো বা তা নয়। হয়তো বা কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হবে, বলবে, 'আপনারা আমার পূর্বজন্মের পরমাত্মীয় ছিলেন।'

এখন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না ওর নাম কি, ওর স্বভাব কি।

এখন শুধু নিষ্পলকে চেয়ে বসে থাকা, ও কখন চোখ খুলবে।

কিন্তু মৃণাল কেন?

যার প্রাণের মধ্যে আছড়া-আছড়ি করছে, যার মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীটা ছুটোছুটি করে দেখে বেড়ায় কোথায় আছে তার জীবনের জ্যোতি, সে কেন একটা অর্ধেক-দরজা-ভেজানো আধ-অন্ধকার ঘরে নাম-পরিচয়হীন সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা অচৈতন্য মেয়েকে আগলে বসে আছে স্তব্ধ হয়ে?

সে-কথা খুঁজতে গেলে ওই স্তব্ধতার গহ্বরেই চোখ ফেলতে হয়।

সমস্ত বিশ্ব ছুটোছুটি করে বেড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর, কিন্তু পথে বেরোবার সাহস নেই। ওর মনে হচ্ছে ওর সর্বাঙ্গে লেখা হয়ে গেছে সেই ভয়ঙ্কর পরাজয়ের ইতিহাস। ওর ললাটে আঁকা হয়ে গেছে সেই কলঙ্কের রেখা।

ও পথে বেরোলেই লোকে প্রশ্ন করবে, 'ব্যাপারটা কী হলো বলুন তো?'

অতএব চোরের মতো লুকিয়ে থাকবে ও।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে সেই চোরকে মুখ দেখাতে হবে?

হবে না। হবে না। জ্যোতিকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, কলকাতার ওই বেসরকারী অফিসের কাজটা ত্যাগ করে চলে যাবে সে পরিচিত সমাজ থেকে অনেক দূরে। যেখানে কেউ জিজ্ঞেস করবে না, ব্যাপারটা কি হলো বলুন তো?

কিন্তু জ্যোতিকে তবে খুঁজবে কে? জ্যোতিকে খোঁজা হবে কি করে?

খুঁজতে হলেই তো তার প্রথম সোপান হবে ঘোষণা করে বলা, 'জ্যোতিকে হারিয়েছি আমি।'

না, মৃত্যু এসে নিয়ে যায়নি তাকে, গৌরবের পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা নয় তার। তার পথ অন্ধকারের। আর তার পৌরুষহীন স্বামীর নির্লজ্জ ভীরুতা সেই অন্ধকারের দর্শক।

জ্যোতি যদি বেঁচে থাকে, খোঁজ দেবে না নিজের? যেমন করে হোক? এক লাইন চিঠিতে? একটা মানুষের মুখে?

কিন্তু তারপর? জ্যোতি যদি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে আসে?

চিন্তায় দৃঢ় হলো মৃণাল।

জ্যোতি, তুমি যে অবস্থায় আসো, এ ঘর তোমার জন্যে চিরদিন খোলা থাকবে। মৃণাল প্রমাণ করবে ভালবাসা কখনো মরে না।

॥ ১৮ ॥

তবু প্রশ্নটা তো রয়েই গেল! মৃণাল কেন?

মৃণালের হাহাকারের কথা বাদ দাও, নিয়ম-নীতির কথাই বলো। মৃণাল কেন আগলাবে বসে অচৈতন্য একটা অপরিচিতা তরুণী মেয়েকে?

লীলাবতী নেই? ভক্তিভূষণ নেই? মানবিকতা করতে চান তো ওঁরাই করুন! নিয়ম-কানুনের জ্ঞান নেই ওঁদের?

আছে। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি আছে ভয়। লজ্জার ভয়, সম্ভ্রমহানির ভয়, সমস্ত অহঙ্কার ধুলিসাৎ হবার ভয়। যদি হঠাৎ কেউ এসে পড়ে? পড়শীর তত্ত্ব নেওয়া কর্তব্য মনে করে? মহিলা অথবা পুরুষ? তারা তো লীলাবতীর কাছেই আসবে, ভক্তিভূষণের কাছে আসবে। তখন?

তার থেকে ওঁরা বাইরের দিকে ঘাঁটি আগলান, মৃণাল ভিতরে পাহারা দিক। কেউ এলে লীলাবতী বলবেন, 'হ্যাঁ খুব জ্বর, ছেলে রয়েছে ঘরে, আমি এই হুটো রান্না করে নিচ্ছি।'

'ছেলে রয়েছে ঘরে'—ওটা একপ্রকার নিষেধবাণী। যাবে না কেউ।

যদি ভক্তিভূষণের কাছে আসে?

ভক্তিভূষণ বলবেন, 'হ্যাঁ জ্বর। বোধহয় হঠাৎ ঠাণ্ডায়।···না না, ডাক্তার লাগবে না, আমি দিয়েছি ওষুধ। একটু-আধটু হোমিওর চর্চা করে থাকি।' তারপর দেশের সমস্যার কথা পাড়বেন।

বসে বসে মিথ্যার জাল রচনা করা হচ্ছে। জানে না সেই জালে আর কেউ পড়তে আসবে না। এ-বাড়ির এই তিনটে মানুষকেই ঘিরে ফেলতে সেই জাল।

কিন্তু জাল যারা রচনা করে, তারা কি বোঝে তা? তারা ফাঁসের পর ফাঁস গাঁথে, আর ভাবে বিপদ-মুক্তির পথ আবিষ্কার করছি।

॥ ১৯ ॥

মাছিটা ঘুরছে। বার বার এসে বসছে গালে কপালে মুখে।

বার বার কুঞ্চনরেখা পড়ছে ভুরুতে।

মৃণাল তাকিয়ে আছে সেই দিকে। আছে প্রত্যাশার দৃষ্টি মেলে।

ওই স্পন্দনের পথ ধরে কখন খুলে পড়বে ওই ভুরুর নীচের বুজে থাকা চোখ হুটো। মাছিটাকে তাই তাড়াবে না মৃণাল।

মৃণালের চিন্তাটা কার্যকরী হলো।

ওই ভুরুটা আর একবার কুঁচকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ উঠল, 'উঃ!'

মৃণাল সরে এল।

মৃণাল ওর নাকের সেই চশমা পরার খাঁজটা দেখল, গলার সরু ঝিরঝিরে হারটা দেখল, লীলাবতীর ঢাউস সেমিজ আর চওড়া পাড়ের শাড়ি-পরা অদ্ভুত-দেখানো দেহটা দেখল, এলিয়ে পড়া হাত দুটো দেখল, দেখল রুক্ষু জমাট-বাঁধা চুলগুলো, তারপর আস্তে আস্তে ডাকল, 'শুনুন।···শুনছেন ?'

চোখটা কুঁচকে ছিল, তবু বোজাই ছিল। এই ডাকে, অথবা এমনিই সেই বোজা চোখ দুটো একবার খুলল।

কেমন একটা বিহ্বল অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর আবার বুজে ফেলল। একটা যেন নিশ্বাস পড়ল।

মৃণালের বুকের মধ্যেটা মোচড় দিয়ে উঠল।

মৃণাল ভাবল, অথচ বিধাতার এতটুকু ইচ্ছেয় এ জ্যোতি হয়ে যেতে পারত !

তারপর ভাবল, হয়তো জ্যোতিও এমনি কোনোখানে অসহায় চোখ মেলে চারিদিক তাকিয়ে দেখে আবার চোখ বুজে ফেলছে। হয়তো গভীর একটা নিশ্বাস পড়ছে তার বুক ভেঙে।

চৈতন্য নেই। তবু ক্লান্ত বিষণ্ণ নিশ্বাসটা উঠে আসতে পারে কোথা থেকে ?

মৃণাল আবার বলল, 'শুনছেন ?'

এবার ও চোখ খুলল।

তাকিয়ে থাকল।

বিস্ময় নয়, প্রশ্ন নয়, ভাবশূন্য দৃষ্টি।

মৃণাল কোনো প্রশ্ন খুঁজে না পেয়ে বলল, 'জল খাবেন ?'

ও উত্তর দিল না। যেন অচেতনার অন্ধকার থেকে চেতনার মোহানায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেন বুঝতে পারছে না কোন্ দিকে তাকাবে। সামনে না পিছনে।

মৃণাল ব্যগ্রভাবে আবার বলে, 'শুনুন, জল খাবেন ?'

ও সম্মতির দৃষ্টিতে তাকাল।

মৃণাল উঠে গিয়ে কুঁজো থেকে জল এনে দাঁড়াল, মৃণাল ঘরের দরজাটার দিকে তাকাল।

আধ-ভেজানোই রয়েছে।

এখানে দরজা জানলায় পর্দা নেই।

জ্যোতি একখানা পর্দা এনেছিল শাড়ি জামার সঙ্গে, নিজের শোবার ঘরে টাঙিয়েছিল। এ ঘরটা লীলাবতীর। এখানে পর্দার প্রয়োজন ছিল না। এখন যদি প্রয়োজন হয়, দরজাটাকেই বন্ধ করতে হবে। কিন্তু বন্ধ দরজা কী অস্বস্তিকর!

সেই অস্বস্তির দিকে তাকাল মৃণাল।

আর শুনতে পেল ঝিটা বলছে, 'বৌদি যে তোমার ঘরে মা ?'

মৃণালের ভয় হলো।

মৃণালের মনে হলো, ওই ঝিটা সব যেন জেনে বুঝে অবোধের ভান করে জেরা করছে। ওর জেরার স্রোতের মুখে পড়ে লীলাবতী কুটোর মতো ভেসে যাবেন। আর তখন গ্রামসুদ্ধু সবাই জেনে ফেলবে—

জলটা হাতে নিয়েই মৃণাল কান খাড়া করল, মা কি বলেন। কিন্তু লীলাবতীকে ভয় করবার কিছু নেই। লীলাবতী ভেসে যাবেন না। লীলাবতী এখন পাকা অভিনেত্রী হবেন। ভেঙে পড়া শরীরকে এখন চাঙ্গা করে নিয়ে আবার উঠেছেন লীলাবতী শুধু ওই অভিনয়ের তাড়নায়। তাই লীলাবতী সহজেই বলতে পারলেন, 'সারারাত মাথায় জল বাতাস, হাতে পায়ে সেঁক, দাদাবাবু অত পারবে কেন ? তাই এঘরেই নিয়ে এসেছি—'

মৃণাল একটু আশ্বস্ত হলো।

মৃণালের মনে হলো, মাকে যেমন বোকা ভাবি তা নয়। মা বেশ ম্যানেজ করে ফেলতে পারবেন। একে সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে আমাদের, নিজেদের প্রেস্টিজ রাখতেই। কিন্তু জ্ঞান হলে কি থাকতে চাইবে সে ?

ঝি-টা বলছিল, সরকারি ইস্কুলের দিদিমণি হারিয়ে গেছে

এই কি তা'হলে সেই দিদিমণি ?

এরও কি জ্যোতির মতো অবস্থা ঘটেছিল ? শুধু এ তাদের কবল থেকে পালিয়ে এসে—

মৃণাল একটু ক্ষুব্ধ হাসি হাসল, আমি জগতের সব ঘটনাতেই সেই একই ঘটনা দেখব নাকি ?

হয়তো ঝড়ে এর চাল উড়ে গিয়েছিল, হয়তো ছুটে কোথাও আশ্রয় নিতে গিয়ে প্রবল বর্ষণের দাপটে দিশেহারা হয়ে ছুটে এসে ওই ভাঙা গোয়ালটায় আশ্রয় নিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু কোথায় সেই সরকারি স্কুল ?

কোথায় তার সেই কোয়ার্টার্স ?

মাছিটা আবার উড়ে উড়ে বসছে।

ওটাই কি ওই অচৈতন্য মানুষটাকে চৈতন্যের দরজায় টেনে আনবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ?

তা তার চেষ্টায় কাজ হলো।

মানুষটা মাছি ওড়ানোর অভ্যস্থ ভঙ্গীতে হাত নাড়ল। বলে উঠল, 'আঃ'। তারপর বলল, 'জল'।

মৃণালের হাতে জলের গ্লাস, অথচ মৃণাল ভেবে পাচ্ছিল না তারপর কি করবে।

ও কি মাকে ডেকে আনবে ?

না নিজেই ভার নেবে ?

এবার সচেতন হলো, আস্তে ওর কপালে একটা হাত রেখে সাবধানে জল ঢেলে দিল।

ও জল খাবার পর যেন পরিষ্কার দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর আস্তে বলল, 'এ বাড়িটা কাদের ?'

'আমাদেরই।'

'আপনারা কে ?'

'আমরা ?' মৃণাল ইতস্তত করে বলল, 'আমার নাম মৃণাল ঘোষ।'

ও আবার ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

মৃণাল তাকিয়ে দেখল, ওর চোখের পাতা কাঁপছে। কাঁপছে নাকের পাশ। ঠোঁটের কোণে স্পন্দন উঠছে মাঝে মাঝে।

বোধ হয় ভাবতে চেষ্টা করছে।

'কিছু খাবেন ?'

মৃণাল বলল।

মেয়েটা এবার চোখ খুলে ভাল গলায় বলল, 'কী খাবো ?'

'এই···ইয়ে গরম দুধ কি হরলিকস্!'

বাবার হরলিকস্ আছে জানে মৃণাল।

মেয়েটা কী ভাবল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'না'।

মৃণাল ব্যগ্র গলায় বলল, 'কেন ? না কেন ? দু-তিনদিন তো খাননি ?'

মেয়েটা বিরক্তিতে কপাল কোঁচকালো।

বলল, 'কে বললে ?'

'দেখতেই তো পাচ্ছি। সেই ঝড়ের রাত থেকে—'

'আঃ। চুপ করুন।'

মেয়েটা হঠাৎ তীব্র চিৎকার করে উঠল।

মৃণালের মনে হলো, ওই ঝড়ের স্মৃতি ওর কাছে ভীতিকর।

মৃণালের হঠাৎ মনে হলো, এই মেয়েটা কি সত্যি কোনো মেয়ে ? না একটা ছলনা ? শুধু জ্যোতির অবস্থাটা বোঝাতে, ওই ছলনামূর্তি এসে আছড়ে পড়েছে ?

জ্যোতিও হয়তো এমনি এই তিন-তিনটে দিন অনাহারে—

সমস্ত শরীরটার মধ্যে একটা আলোড়ন উঠল, মাথার মধ্যে রক্তের ছুটোছুটি।

মৃণাল এখন কে-জানে-কে একটা মেয়েকে তোষামোদ করছে গরম দুধ খাবার জন্যে, হরলিকস্ খাবার জন্যে।

মৃণাল তা'হলে পাথর ?

হয়তো পাথর !

হয়তো মমতার সাগর !

তাই মৃণাল আবার বলল, 'ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছেন, একটু কিছু না খেলে—'

মেয়েটার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

মেয়েটা আস্তে বলল, 'আমি বাঁচতে চাই না।'

বাঁচতে চাই ! বাঁচতে চাই !

এই হচ্ছে পৃথিবীর সার ধ্বনি।

আসুক দুঃখ, আসুক লাঞ্ছনা, আসুক ক্ষয়-ক্ষতি শোক তাপ, দারিদ্র্য দুর্বিপাক, তবু বাঁচতে চাই। দেহে বাঁচতে চাই, মনে বাঁচতে চাই।

তবু বাঁচার পথ দুরূহ। বাঁচার পারমিটটা দুষ্প্রাপ্য।

কিন্তু ওই সমবেত কণ্ঠের কলরোলের মধ্যেও কদাচ কখনো এক-আধটি ক্ষীণ কণ্ঠ বলে ওঠে, 'আমি বাঁচতে চাই না।'

অথচ তাকে বেঁচে থাকতে হয়।

মনে না হোক, দেহে।

প্রতিক্ষণ মৃত্যুকামনা করে করে আয়ুর ঋণ শোধ করতে হয়।

তাই এই বর্ষার জলে ভেসে আসা মেয়েটার আপত্তিও টিকলো না, তাকে বাঁচবার জন্যে গরম দুধ খেতে হলো, তাকে গরম হরলিকস্ খেতে হলো।

লীলাবতীই এলেন গরম দুধ নিয়ে।

বললেন, 'এটুকু খেয়ে ফেলো দিকি।'

ও বলল, 'আপনারা আমার জন্যে এত করছেন কেন ?'

লীলাবতী রসহীন গলায় বললেন, 'এত আর কি। মানুষের জন্যে মানুষ এটুকু করবে না? নাও, খেয়ে নাও।'

মেয়েটা উঠে বসতে গেল।

লীলাবতী হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'উঠো না উঠো না, মাথা ঘুরে যাবে। দুর্বল হয়ে গেছ তো বেজায়!'

মেয়েটা তবু উঠে বসল, আস্তে সাবধানে।

হাত বাড়িয়ে দুধটা নিল।

লীলাবতী বললেন, 'নাম কি তোমার?'

'মালবিকা মিত্র।'

'তুমি এখানকার ইস্কুলের দিদিমণি?'

'মা!' মৃণাল ঘরের কোণে একটা হাতলভাঙা আরাম চেয়ারে বসে একখানা বই পড়ছিল, মা'র ওই প্রশ্নে নিষেধের সুরে ডাকল, 'মা!'

অর্থাৎ এখনি ওকে ব্যস্ত করো না মা!

লীলাবতীর রাগ হলো।

লীলাবতীর মনে হলো, মৃণাল যেন অধিকারের কোঠায় দাঁড়িয়ে লীলাবতীকে অনধিকারচর্চায় নিষেধ করছে।

কেন?

হঠাৎ মৃণালই বা এই কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটার স্বত্বাধিকারী হয়ে উঠল কেন?

লীলাবতী রাগের গলায় বললেন, 'কেন? জিজ্ঞেস করলে কী হয়? কোথা থেকে এসেছে, কাদের মেয়ে. সেটা জানতে হবে না?'

'সেটা পরে জেনে নিলেও চলবে—'

দৃঢ়কণ্ঠে বলল মৃণাল।

লীলাবতী গুম্ হয়ে গেলেন।

লীলাবতী কথা বললেন না, খালি গেলাসটা নিয়ে চলে গেলেন। গিয়েই ভক্তিভূষণের সামনে দাঁড়ালেন।

রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'কী জাত না কী জাত, তার এটো ধরতে হবে, অথচ একটা কথা জিজ্ঞেস করবার স্বাধীনতা থাকবে না আমার?'

ভক্তিভূষণ বোধহয় ব্যাপারটা অনুমান করলেন। ভক্তিভূষণ বললেন, 'দুর্বলতাটা একটু যাক—'

'সেটুকু জ্ঞান আমার আছে—', লীলাবতী তীব্র স্বরে বলেন, 'নামটাও তো জানা দরকার? না কি? ডেকে খাওয়াতে হবে যখন।'

লীলাবতী চলে যেতে মালবিকা আস্তে ডাকে, 'শুনুন—'

মৃণাল উঠে এসে বলে, 'বলুন।'

'উনি আপনার মা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনারা এখানেই থাকেন?'

মৃণাল কষ্টে বলে, 'না, কলকাতায়। এখানে বেড়াতে আসা হয়েছিল।'

'বেড়াতে?'

মালবিকার মুখে বুঝি একটু হাসি ফুটে ওঠে, 'এখানে কেউ বেড়াতে আসে?'

'দেশের বাড়ি।'

'ওঃ।'

মালবিকা একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আপনি, আপনার মা আর বাবা?'

আবার মাথার মধ্যে উত্তপ্ত রক্তের ছুটোছুটি।

তবু মৃণাল কষ্টে বলে, 'হ্যাঁ।'

'আমাকে নিয়ে আপনাদের বিপদ হলো।'

ক্ষীণ মৃদুকণ্ঠে বলল মালবিকা।

মৃণাল ভাবল, বিপদ না বিপদ-ত্রাণ!

আমরা যা পরিকল্পনা করছি, তাতে তুমিই হবে আমাদের মান-সম্ভ্রমের রক্ষয়িত্রী। কিন্তু তুমি কি তাতে রাজী হবে?

অবশ্য তোমায় আমরা কিছু বলব না, শুধু বলব—তোমার চিকিৎসার দরকার, আমাদের সঙ্গে চল—

কিন্তু তুমি সেই যাওয়াটায় রাজী না হতেও পার। দুর্বলও তো তুমি কম নও।

অথচ এখনি আমাদের চলে গেলে ভাল হয়। পাড়ার লোক না জানতে!

আশ্চর্য!

এই দু'দিন আগে ভক্তিভূষণ মৃণালের ছুটির কথা তুলেছিলেন বলে মৃণাল অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আজ নিজেই মৃণাল এইসব সাংসারিক কথাগুলো ভাবতে পারছে।

হয়তো মানুষের সবকিছুর ওপর হচ্ছে সম্ভ্রম।

সব যায় যাক। সম্ভ্রমটুকু যেন না যায়।

মৃণালরা চারজন এসেছিল, চারজনকেই ফিরে যেতে হবে। তা নইলে একজনের ঘাটতিতে এক হাজার কথার জবাব দিতে হবে। আর শেষ পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গ্রাম থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

অতএব—

'আমরা চারজন এসেছিলাম, চারজনেই যাব।' কথাটা বলেছিলেন ভক্তিভূষণ। 'আর সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ওর একটা চিকিৎসারও দরকার।'

কিন্তু সেটা কোথায় রেখে?

মৃণালদের সেই দু'ঘরের ফ্ল্যাটটাতেও কি সেই নিয়মটাই রক্ষিত হবে?

চারজনের জায়গায় চারজন?

'আঃ! পাগল তো নই আমি—' বলেছিলেন ভক্তিভূষণ, 'এ ছাড়া আর উপায় দেখছি না বলেই বলতে হচ্ছে। গিয়েই হসপিটালে ভর্তি করে দিতে হবে। কে জানে কী অবস্থায়—'

চুপ করে গিয়েছিলেন।

একটা ভয়াবহ আশঙ্কা তো সকলেরই বুকে পাথর চাপিয়ে রেখেছে।

মুখ ফুটে কেউ বলে না।

কী করে বলবে?

সেই বলার মুখে যে জ্যোতি দাঁড়িয়ে আছে অনড় হয়ে।

অন্য কারো কথা বলতে গেলেই যে জ্যোতি নিরাবরণ হয়ে যাবে।

মৃণাল বলল, 'বিপদ বলছেন কেন?'

'বিপদ নয়?'

'সাধারণ কর্তব্য মানুষ মাত্রেই করে থাকে।'

'মানুষ!' মালবিকা একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলে, 'মানুষ শব্দটার মানে ভুলে গেছি।'

মৃণাল একটু চমকালো। মৃণালের মনে হলো, নেহাত আজে-বাজে সাধারণ মেয়ে নয়। কথা বলতে জানে।

'কথা বলতে জানে' এটা একটা প্রশংসাপত্র বৈকি। ক'জন জানে কথা বলতে? বেশীর ভাগ লোকই তো শুধু কথা কয়।

॥ ২০ ॥

'আমার মনে হয়, একেবারে কিছু না বলাটা ঠিক হবে না।'

ভক্তিভূষণই বললেন এ-ঘরে বসে। 'একটু অবহিত করিয়ে নিয়ে গেলেই বোধ হয়—'

লীলাবতী বললেন, 'কিসের অবহিত ?'

'এই যে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব অন্য পরিচয়ে—'

ভাবছিলেন ভক্তিভূষণ, সেই কথা।

কিন্তু আশ্চর্য, মালবিকা নামের মেয়েটাও ঠিক সেই কথাই ভাবছে, এখান থেকে চলে যাব নিজের পরিচয়ে নয়, অন্য পরিচয়ে—

গ্রামোন্নয়ন শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্রের দিদিমণি মালবিকা মিত্র মুছে যাক, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। একটা নাম-গোত্রহীন পথে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে নতুন পরিচয়ে বেঁচে উঠুক।

আমি যখন 'মানুষ' শব্দটার মানে ভুলে যাচ্ছিলাম, তখন এদের দেখলাম।

মনে মনে ভাবল মালবিকা।

তারপর একসময়ে যখন মৃণাল একবার এসেছে ওর তত্ত্ব-তল্লাস নিতে, তখন আস্তে বলল—'আমার নাম পরিচয়, সব কিছু এখানে ফেলে দিয়ে চলে যেতে চাই।'

মৃণাল তাকিয়ে দেখল।

মৃণালের চোখে একটা জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল।

মালবিকা বলল, 'আমাব পরিচয়ে আমার ঘৃণা!'

ভগবান নেই, আবার আছেনও।

নইলে এরা যখন ভাবতে বসেছে ওকে কি করে বলা যায়—তোমার ওই মালবিকা মিত্র নামটা কয়েক ঘণ্টার জন্যে ভুলে যেতে হবে তোমাকে। 'ঘোষ' পরিচয়ে আমাদের সঙ্গে চল তুমি—

ও তখন নিজেই বলে ওঠে, 'আমার পরিচয় নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়ে নতুন পরিচয়ে জন্মাতে চাই।'

তবে?

ভগবান নেই?

ভক্তিভূষণ বললেন, 'তাই যদি তো চল এখন আমাদের পরিচয়ে। সেটাই হবে তোমার নতুন পরিচয়। ঘোষদের একজন হলে তুমি।'

ভক্তিভূষণ এসে স্ত্রীকে বললেন, 'হাতে চাঁদ পেলাম আমি! এখন ওই ভাবেই নিজেদের লোক বলে জানিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তারপর কলকাতায় গিয়ে—'

লীলাবতীও ষড়যন্ত্রে ছিলেন।

লীলাবতী এই নতুন মেয়েটার প্রতি আর তেমন বিরূপও থাকছিলেন না, কিন্তু আজ হঠাৎ লীলাবতী ডুকরে কেঁদে বললেন, 'ওগো কী পাষাণ প্রাণ আমার! আমার সোনার প্রতিমাকে এখানে ফেলে রেখে কাকে-না-কাকে তার নামে সাজিয়ে ফিরে চলে যাচ্ছি!'

ভক্তিভূষণ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, চুপ করলেন। মৃণাল এসে দাঁড়িয়েছে। 'মা, কী পাগলামী শুরু করেছ বল তো? ওঁর জ্ঞান হয়েছে, সব বুঝতে পারছেন, যদি এ-সব কানে যায়?'

লীলাবতী বললেন, 'আমি যে ধৈর্য ধরতে পারছি না বাবা!'

মৃণাল শুকনো গলায় বলল, 'আমি পারছি।'

লীলাবতী চুপ করে গেলেন। সত্যিই তো, মৃণাল যদি পারে, তিনি অধীর হবেন কোন্ মুখে? লীলাবতী কি মৃণালের থেকেও বেশি আপন জ্যোতির?

ভক্তিভূষণ বললেন, 'ও রাজী আছে তো?'

'সেটাও হওয়াতেই হবে।'

'বেশ সুস্থ বোধ করছে?'

'নিজেই তো দেখছ সবসময়।'

'দেখলাম—ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো আর হাসপাতালের দরকার হবে না।'

'অসুখ তো কিছু না, শুধু অমানুষিক কষ্টে সেন্সলেস্ হয়ে যাওয়ার দুর্বলতা।' বলল মৃণাল।

ভক্তিভূষণ মনে মনে বললেন, সেই অমানুষিক কষ্টটা কিসের,

সেটাই তো জানা গেল না। তুমি যে আবার বড্ড বেশি 'ইয়ে করছ। কিছু জিজ্ঞেস করতে পারা যাবে না। এ কী আশ্চয্যি!

মুখে বললেন, 'ঘোড়ার গাড়িকে বলে এলাম। ভোরের ট্রেন ধরিয়ে দেবে।'

'ক'টার গাড়ি?'

'সাড়ে পাঁচটা। সেটাই ভাল!'

তা সেটাই ভাল বৈকি। পাড়ার লোক টের পাবে না।

কেউ এসে উঁকি দিয়ে বলে উঠবে না, 'একী, তোমাদের চারজনের মধ্যে একজনের চেহারা বদলে গেল কী করে?'

॥ ২১ ॥

কিন্তু সে কি অতটা বদলে যেতে রাজী হচ্ছে? তাকে কি ওই অদ্ভুত প্রস্তাবটা দেওয়া হয়েছে?—তোমার পরিচয় যখন মুছেই ফেলতে চাইছ, তখন আমার দেওয়াটা নাও।

ও কি সম্মতি দিয়ে বলেছে, 'বেশ তো, এতে যদি আপনাদের কিছু সুবিধে হয় তো আমি জ্যোতির্ময়ী ঘোষই সাজব?'

না, খোলাখুলি এসব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না, তবু যেন নিঃশব্দে ঘোষিত হচ্ছে, 'মালবিকা মিত্র আর এই গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষিকা থাকবে না। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে এই গ্রাম আর গ্রামোন্নয়ন থেকে।'

তবে আর ভক্তিভূষণের পরিবারের সঙ্গে মিশে যেতে আপত্তি কি? সেটাই তো আরো সুবিধে। বরং কৃতার্থ হয়েই যাওয়া উচিত।

কে ওকে এত সহজে এখান থেকে নিয়ে যেত? কে ওকে এই নিতান্ত দুঃসময়ে দেখত? কে অকারণে এমন স্নেহ দিয়ে সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে তুলত? মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিল মালবিকা, এরা সে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে।

॥ ২২ ॥

এ ঘরে লীলাবতীর শাশুড়ীর আমলের একখানা বড় আয়না আছে। যদিও তার সর্বাঙ্গে বয়সের রেখা, তবু সেই অসংখ্য গোল গোল কালো কালো দাগের ফাঁক থেকেও অবয়বের একটা আভাস পাওয়া যায়।

সেই আভাসের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসলো মালবিকা। আবার এই বেশভূষা নিয়ে ট্রেনে চড়তে হবে ভেবে বিচলিতও হলো।

লীলাবতীর গায়ের মাপের সেমিজ, আর লীলাবতীর চওড়া-পাড় শাড়ি।

কৌতুকপ্রদ সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজেকে অন্যের কৌতুকের খোরাক ভাবতে ভাল লাগে না।

মালবিকা ভাবল, আচ্ছা, একটা সেট তো পরা ছিল আমার? সেটা কোথায় গেল? কাচা হয়েছে অবশ্যই। এত যখন হচ্ছে!

এত হচ্ছে! আশ্চর্য, কত হচ্ছে! অথচ কিছুই না হতে পারত।

বাইরে পায়ের শব্দ হলো।

মালবিকা তাড়াতাড়ি আরশীর সামনে থেকে সরে এল। বসে পড়ল খাটের উপর। আর ওই তাড়াতাড়িটুকুর জন্যে হাঁপাতে লাগল। আরো শিথিল দেখাল।

এ শব্দ তার চেনা হয়ে গেছে।

এই শব্দটির জন্যেই যে সমস্ত চেতনা তৃষিত হয়ে থাকে।

এই তৃষিত হয়ে থাকার জন্যে লজ্জাবোধ করে মালবিকা। ভাবে, এটা আমার অন্যায়, এ বাড়ির কর্তা-গিন্নী কত স্নেহ করছেন, আমার সুবিধে-অসুবিধে দেখতে তৎপর হচ্ছেন, অথচ আমি ওঁদের থেকে ওঁদের ছেলেকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি।

অস্ফুট চেতনার মধ্যে ওর নিকট-সান্নিধ্য অনুভব করলেও স্পষ্ট

জ্ঞান হবার পর থেকে তো দেখছে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে ও, নির্লিপ্ত রাখছে, প্রত্যক্ষ কোনো স্নেহ-মমতার স্পর্শ দিচ্ছে না, তবু মনে হচ্ছে আশ্রয়টা বুঝি ওইখানেই।

তাই তার জন্যেই সমস্ত প্রাণটা উন্মুখ হয়ে থাকে।

কেন? তার এই সাতাশ বছরের কুমারী-জীবনে তরুণ পুরুষ কি দেখেনি মালবিকা?

অতএব এই পাঁচদিনেই প্রেমে প'ড়ে গেল উপন্যাসের নায়িকার মতো?

দূর, এটা হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতাকে অন্যভাবে দেখছে সে!

স্বস্তি পেল। নিশ্চিন্ত হলো। কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ মুখ করে বসে থাকল।

পায়ের শব্দ বাইরে থেকে ঘরে এল। মৃণাল ঢুকল।

মালবিকা দেখল, ওর মুখের রেখায় রেখায় বিষণ্ণতা, ওর চোখের নীচে ক্লান্তির ছাপ। অথচ ও কথা বলে উঠল যেন উৎসাহের গলায়, 'কী হলো, আবার হাঁপাচ্ছেন কেন? বেশ তো চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলেন।'

মালবিকা মৃদু হাসল। 'ভালই তো আছি।'

'ওটা বললে খুব সত্যি কথা বলা হয় না। সত্যি করে তুলুন, সত্যি করে তুলুন।'

মালবিকা আরো কৃতজ্ঞ হলো। আরশী দিয়ে যদি দেখতে পেত, মনে হতো একটু বেশিই হয়েছে। বিহ্বল বিহ্বল দেখাচ্ছে প্রায়।

বলল, 'পূর্বজন্ম নিয়ে ভাবিনি কখনো, এখন ভাবছি।'

'এখন ভাবছেন?'

'হ্যাঁ, ভাবছি নিশ্চয় পূর্বজন্মে আপনারা আমার কাছে খুব মোটা ঋণ করে শোধ দেননি।'

'চমৎকার! আপনার কল্পনা-শক্তি তো খুব প্রখর!'

'বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রখরতায় শান দেবার সময় পাচ্ছি কি না!

সত্যি, মানুষ যে কত মহৎ হতে পারে, তা এখানে এভাবে না এলে জানতেও পারতাম না।'

'ওটাও আপনার কবি-কল্পনা। যে-কোনো মানুষ এটুকু করত।'

মালবিকা একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

তারপর বলল, 'আপনাদের কাছে ক'দিন রয়েছি, কত স্নেহ-মমতা সেবা-যত্ন পাচ্ছি, অথচ কিছুই জানি না আপনাদের।'

'আমরাও আপনার সম্পর্কে একেবারে অন্ধকারে।'

মালবিকা সহসা যেন একটু চমকে যায়, তারপর হতাশ গলায় বলে, 'আসলে যে সবটাই তাই। শুধু অন্ধকার।'

মৃণাল মনে মনে বলে, তার মানে তুমি আমারই সমগোত্র। অতএব সেই একাত্মতা অনুভব করে সে।

মুখে বলে, 'মনে উৎসাহ আনুন, ওটাও একটা চিকিৎসা। জানবেন, আমাদের সম্বন্ধে আস্তে আস্তে সবই জানবেন।'

আপাত বাকা নয়, মৃণাল ভাবছিল, একে সবই বলা যায়। এ তো একই দুঃখের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে। এ ছি-ছি করবে না। এ অবাক হবে না।

মালবিকা আস্তে বলে, 'শুধু তো আজকের দিনটা। কলকাতায় গেলে কে কোথায়—'

কে কোথায়!

'কলকাতায় গেলে কে কোথায়?' মৃণাল অবাক গলায় বলে, 'কলকাতায় গিয়ে আর চিনতে পারবেন না আমাদের?'

'ইস্, ও-কথা কে বলছে?'

'বাঃ, তাই তো বলছেন।'

'মোটেই না। বলছি, কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আপনাদের ছুটি। অবশ্য যা করলেন তার মূল্যনির্ণয় করি এমন ক্ষমতা নেই।'

'বেশ তো, ওটা না হয় পরজন্মের জন্যে তুলে রাখুন। আপনি তো ওতে বিশ্বাসী। পারেন তো তখন সুদে-আসলে শোধ দিয়ে দেবেন।'

শুনে হেসে ওঠে মালবিকা।

হেসে ওঠে মৃণালও।

ওই হাসির সময় মৃণালের চোখের নীচের সেই গভীর কালিমা যেন হালকা দেখায়।

॥ ২৩ ॥

এ-বাড়িতে আবার যথানিয়মে উনুন জ্বালতে হচ্ছে লীলাবতীকে, আবার পাড়তে হয়েছে সেই জ্যোতির হাতের সাজানো চায়ের সাজ।

মানুষ অবস্থার দাস, প্রমাণিত হচ্ছে আর একবার।

প্রমাণিত হচ্ছে মানুষের দেহসত্বই তার সব থেকে বড় শত্রু।

আবার সবচেয়ে বড় প্রভুও।

স্বামীর সামনে খাবার থালাটা এগিয়ে সেই কথাই বলেন লীলাবতী। বলেন, 'ভাবিনি আবার সংসারে হাঁড়ি নাড়ব।'

'উপায় কি! ভগবান যা ফেরে ফেললেন!'

'গোপালের মা'র চোখ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কি ভাবে যে কাটল এই ক'দিন! বাত্তা পোহালে বাঁচি। ঘরে ঢুকতে দিচ্ছি না, বলছি ঘুমুচ্ছে। বলছি, ঘর পরিষ্কার করে ফেলেছি, কিন্তু কাপড় কাচতে গিয়ে প্রশ্ন তুলছে।'

'কেন?' ভক্তিভূষণ অবাক হন। 'মানে?'

'মানে বুঝছ না? বলছে, 'মা, কেবলি তোমার কাপড় কাচছি। বৌদির কাপড়জামা কই?'

ভক্তিভূষণ মাথাটা নীচু করেন। লীলাবতী আঁচলে চোখটা মোছেন।

'বৌদি' শব্দটা উচ্চারণ করলেই বুকটা ফেটে যেতে চায়।

'তোমার কাপড়ই পরতে দিচ্ছ?'

'তাছাড়া ?' লীলাবতী এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেন, 'তার তো অগাধ শাড়ি-জামা, হয়তো চিরদিনের মতোই ফেলে চলে গেল। কিন্তু মৃণালের সামনে সে জিনিসে আমি হাত দিই কি করে ?'

এই সময় হঠাৎ হাসির আওয়াজ এল। এঁরা দু'জনে একসঙ্গে চমকে উঠলেন। দু'জনে একসঙ্গে ওদিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তারপর নিশ্বাস ফেলে একে অপরকে বললেন, 'ওর মুখে আবার হাসি শুনতে পাব ভাবিনি।'

বললেন, 'হঠাৎ এই উটকো বিপদটা দিয়েই হয়তো ভগবান সামলাবার সময় দিলেন। ওর চিন্তা-ভাবনা নিয়ে কাটছে খানিকটা।'

'কলকাতায় যাওয়াটা পিছিয়ে গেল', ভক্তিভূষণ বললেন, 'তবু একরকম সুরাহাই হলো বলতে হবে।'

'মেয়েটার মুখটা কী মিষ্টি দেখেছ ? আর কী নম্র স্বভাব ! জ্ঞান হয়েই আমাদের কষ্ট ভেবে মরমে মরে যাচ্ছে।'

'সেটাই স্বাভাবিক অবশ্য।' ভক্তিভূষণ বলেন, 'জানতে পারলে কিছু ?'

'কি করে জানব ? তোমার ছেলের কড়া শাসন না ? কিচ্ছু জিজ্ঞেস করা চলবে না। বৌমার বাপের বাড়ি নিয়ে ওই রকম করত মনে নেই ?'

লীলাবতী যে কেন খামোকা তার বৌমার তুলনা দিলেন কে জানে।

জ্যোতির মা-বাপ নেই, জ্যোতির ভাই-ভাজ ডিব্রুগড়ে থাকে, অতএব বিয়ে হয়ে ইস্তক তত্ত্ব-তালাসের কোনো প্রশ্ন ছিল না, জ্যোতির বাপের বাড়ি যাওয়ারও না। সে সম্পর্কে একটি প্রসঙ্গ তোলবার উপায় ছিল না। মৃণাল বিরক্ত হতো। এখন মালবিকার সূত্রে সেই কথাটা মনে পড়ল লীলাবতীর।

'যে রকম দেখছি, মনে হয় না বিশেষ কোনো আত্মীয় আছে। থাকলে ব্যস্ত হতো। বে-থাও হয়নি বোধহয়।'

'জানি না বাপু! আজকালকার মেয়েদের তো দেখলে বোঝার জো নেই সধবা, না বিধবা, না কুমারী। বিয়ে-হওয়া মেয়েরা সাজের মতো করে সিঁদুর পরে। ইচ্ছে হলো, পরল, ইচ্ছে হলো না, পরল না। তবে সধবা নয় নিশ্চয়ই। হয় আইবুড়ো, নয় বিধবা।'

'খাওয়া-দাওয়ার বিচার আছে নাকি ?'

'নাঃ। সেসব কিছু নেই। তাই কি থাকে গো আজকাল? শোনোনি তোমার ভাগ্নীর কথা? বলে, 'খাওয়া-পরা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আর অবশ্য-প্রয়োজনীয়, ওর গায়ে নিজের পরিচয়লিপি এঁটে রাখতে হবে? কেন, পুরুষরা তো "আমি বিবাহিত, আমি বিপত্নীক, আমি কুমার", এইভাবে টিকিট এঁটে বেড়ায় না!'

'যত সব ডেঁপোমি!'

ক'দিন পরে আজ প্রথম সহজভাবে কথা বলছেন এঁরা। বোঝা যাচ্ছে এঁদের মুখেও হাসি শোনা যেতে পারে। হয়তো এখনি। অসম্ভব নয় সেটা। এমনকি লীলাবতী একথাও বলছেন, 'ডাল দেব আর একটু ?'

দিচ্ছিলেন, মৃণাল এসে দাঁড়াল। যেন কিছু বলতে এসেছে, ইতস্তত করছে।

লীলাবতী বললেন, 'বলবি কিছু ?'

মৃণাল আর একবার ইতস্তত করে বলে ফেলল, 'বলছিলাম, তোমার ওই শাড়ি-টাড়িগুলো তো অদ্ভুত!···ট্রেনে যেতে হবে···এ ঘরে তো অনেক শাড়ি ব্লাউজ পড়ে রয়েছে।'

পড়ে রয়েছে! হয়তো চিরদিনই তাই থাকবে।

সেই অপচয়টার দিকে চোখ পড়েছে লীলাবতীর গোছালো ছেলের।

লীলাবতী বললেন, 'তার কাপড়!'

'অনেক তো রয়েছে।'

॥ ২৪ ॥

লীলাবতী অতঃপর একখানা হালকা নীল রঙের শাড়ি আর গাঢ় নীল রঙের ব্লাউজ বার করে নিয়ে এলেন, নিয়ে এলেন সায়া।

বললেন, 'ট্রেনে যাবে, এগুলো পোরো। ঠিক করা থাক, খুব ভোরের গাড়ি।'

মালবিকা অবাক হয়ে তাকাল। বলল, 'এ শাড়ি কার? আপনার মেয়ের?'

লীলাবতী কষ্টে বললেন, 'ধর তাই।'

মালবিকা এই কষ্টটা দেখে থতমত খেল।

ভাবল, বোধহয় খুব একটা দুঃখের জায়গায় ঘা দিয়েছে। মৃতা কন্যার স্মৃতির সম্বলগুলি তাকে ধরে দিচ্ছেন দেখে লজ্জায় মরে গেল। আস্তে—নিজের সেই শাড়ি-জামার কথা তুলল। যেগুলো পরনে ছিল সেদিন।

লীলাবতী জানালেন, সেই অকথ্য কাদামাখা জিনিসগুলো ধোপার বাড়ি ঘুরে না এলে ব্যবহার করা অসম্ভব। সেগুলো জড় করে ময়লা কাপড়ের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন কলকাতায়।

মালবিকা আরো আস্তে বলে, 'তবে এই থাক না, যা পরে আছি। এগুলো রেখে দিন।'

লীলাবতী ওর গায়ে মাথায় হাত রাখলেন, বললেন, 'আমার এই বেঢপ গায়ের বেঢপ জামা, ও পরে রেলগাড়িতে চড়া যায়? রাখো এগুলো। তুমি যা ভাবছ, তা নয়। আমার মেয়ের নয়। মেয়ে হয়নি আমার, ওই একমাত্তর ছেলে। সে-সব কথা পরে বলব।'

॥ ২৫ ॥

কাল ভোরে রওনা।

আজ রাত্রে, যখন বাইরের কারো এসে পড়বার ভয় নেই, তখন একটু এ-ঘর ও-ঘর করে দেখতে পারা যায় বাড়িটা। ভাবল মালবিকা।

ক'দিন রইল, শুধু একটা ঘরের মধ্যে প্রায় লুকিয়ে।

হ্যাঁ, লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন তো মালবিকাও অনুভব করেছে। কে বলতে পারে কার চোখে পড়ে যায়। গ্রামোন্নয়নের মালবিকা মিত্র এখানে কোন্ সূত্রে, এ প্রশ্ন মুখর হয়ে উঠবে না?

নিরুত্তর প্রশ্নের মধ্যে ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে যেতে চায় মালবিকা। দাগী হয়ে এখানে চরে বেড়াতে পারবে না।

এদের এই মস্ত দোতলা বাড়িটা অনেক দেওয়াল, অনেক ঘর, অনেক খিলেনে মোড়া বলে তবু নির্ভয়। কিন্তু ভাল করে দেখা হয়নি।

আস্তে বেরিয়ে এল।

ভক্তিভূষণের চোখে পড়ল।

ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এ কী, এ কী, তুমি কেন মা আবার? জল খাবে?'

মালবিকা মৃদু হাসল।

ভক্তিভূষণের মনে হলো হাসিটা ঠিক বৌমার মতো। নিশ্বাস ফেললেন।

মালবিকা বলল, 'জল চাই না। ভাবছি, আপনাদের এই বাড়িটায় পাঁচ-ছ'দিন রইলাম শুধু শুয়ে। আজ একটু দেখি—'

ভক্তিভূষণ প্রীত গলায় বললেন, 'দেখ। পারবে তো?'

'যতটা পারি।'

'পড়ে-টড়ে যেও না। সাবধানে দেওয়াল ধরে ধরে যাও।

এতবড় বাড়ি, ঠাকুর-দালান, বার-বাড়ি, সব দেখতে গেলে তোমার পায়ে ব্যথা হয়ে যাবে।’

মালবিকা আর একবার হাসল।

ভক্তিভূষণ আর একবার বিচলিত হলেন।

॥ ২৬ ॥

অনেক ঘুরে শেষে এই ঘর। মৃণালের ঘর। অবচেতনের অন্তরালে এইটাই কি লক্ষ্য ছিল ?

এদিকে-ওদিকে হ্যারিকেনের আলো, মৃণালের ঘরে জ্বলছে একটা হ্যাজাক। চোখটা ধাঁধিয়ে গেল প্রথমটায়।

তারপর চোখকে সামলে নেবার পর আর একবার ধাধালো। অবাক হয়ে গেল। এ তো অবিবাহিতের একক ঘর নয়, এ ঘরের সর্বত্র যে যুগল জীবনের স্বাক্ষর !

এর মানে কি ? কোথায় আবার সেই একজন ? ওই বড় কাঠের আলনাটায় যার রঙীন শাড়ি ঝুলছে, ঐ জল-চৌকিটার উপর যার চুল বাঁধার আর প্রসাধনের শৌখিনতম আর আধুনিকতম সব সরঞ্জাম সাজানো !

বিছানাটা ওল্টানো রয়েছে তাই, হয়তো ওর অন্তরালেও অবস্থান করছে চুলের গন্ধ আর ফুলের গন্ধ জড়ানো উপাধান।...

কী এই রহস্য ? যতদূর শুনল, তাতে তো জেনেছে এঁরা দীর্ঘকাল পরে কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন, ছুটি ফুরিয়েছে চলে যাচ্ছেন।

তবে ? ওঁর স্ত্রী কি হঠাৎ বাপের বাড়ি কি কোথাও চলে গেছে ? কোনো দরকারে ? কিন্তু তাহলে একবারের জন্যেও তার নাম উচ্চারিত হয় না কেন ? ঝগড়া করে চলে গেছে ?

তাহলে—এমন ভাবে, এইমাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে এমন ভাবে সাজানো রইল কেন ?

তবে কি—? তবে কি—? হাতে-পায়ে একটা হিম-শীতল অনুভূতি বয়ে গেল। দুর্বলতা অনুভব করল। বসে পড়ল। তাই কি ওঁর চোখের কোলে কালি, মুখের রেখায় বিষণ্ণতা ?

একটুক্ষণ বসে রইল, অনেকটা ভাবল, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না, খুব সম্প্রতি একটা মৃত্যু ঘটে গেছে এ-বাড়িতে। তাহলে কী! তাহলে কী! জানালার নীচে একখানা পত্রিকা পড়ে রয়েছে, হাতে তুলে নিল। দেখল, মাঝখানের খাঁজে একটা চুলের কাঁটা গোঁজা। লোহার কাঁটা।

'পড়বেন বইটা ?'

মালবিকা চমকে উঠল। ও কি অনেকক্ষণ এসেছে ?

দেখছে, মালবিকা বোকার মতো পত্রিকাটা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে।

মৃণাল আবার বলল, 'পড়ুন না!'

বলল। অথচ নিজে ও হাত দেয়নি। কাল ভোরে চলে যেতে হবে, লীলাবতী বলেছেন, 'তোর জিনিসপত্রগুলো একটু গুছিয়ে নিতে হবে যে বাবা!'

মৃণাল বলেছে, 'নেব। নেব'খন রাত্রে।'

আর ভেবেছে, কী হয় যেখানে যেমন আছে থাকলে! যদি চাবি দিয়ে রেখে যাওয়া যায়! কোনোদিন যদি এসে চাবি খোলা হয়, যদি জ্যোতি সঙ্গে এসে দাঁড়ায়, বিস্ময়ে পুলকে বিহ্বল হয়ে বলে উঠবে, 'কী আশ্চর্য! যেখানে যেমন রেখে গিয়েছিলাম, সব রয়েছে, অবিকল!'

থাকে না? রাখলে থাকে না? মৃণালের ঠাকুমা'র হাতের সাজানো ভাঁড়ারটা রয়েছে কি করে? শিশি বোতল কৌটো?

লীলাবতী যে দেখিয়ে বেড়ালেন জ্যোতিকে, 'এই দেখ বৌমা, তোমার দিদিশাশুড়ীর হাতের চিহ্ন। এই যে কুলুঙ্গীতে আরশি সিঁদুর-কৌটো, এইটিতে শেষদিন অবধি সিঁদুর পরে গেছেন।'

সে তো কতদিনের কথা।

মৃণালের ঠাকুরদার নিত্য পাঠের চণ্ডীস্তোত্রটা রয়েছে তাকের ওপর, ঠাকুমা'র ব্রতকথা। তবে জ্যোতির হাতের এই পত্রিকাটাই বা থাকবে না কেন? জ্যোতি তখন আহ্লাদে কৌতূহলে বলে উঠবে, 'ওমা, এই যে সেই চিহ্নর কাঁটাটা! গল্পটা পড়তে পড়তে উঠে পড়েছিলাম।' তারপর বলবে, 'তুমি কী গো! এইসব রেখে দিয়েছ তেমনি!'

এত ভেবেছে। অথচ মৃণাল এখন ভদ্রতাকে বড় করল।

বলল, 'পড়বেন তো পড়ুন না!'

মালবিকা হাসল। আস্তে নামিয়ে রাখল। বলল, 'অন্ধচোখে আর পড়ব কি!'

'আই সি!' মৃণাল বিচলিত গলায় বলে, 'আপনার যে চশমা খোয়া গেছে! তাই তো! ইস্! কলকাতায় গিয়েই প্রথম কাজ হবে—চশমার ব্যবস্থা।'

মালবিকা চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'আমার চশমার দায়িত্বও আপনাদের?'

'নিশ্চয়! নিজেই বলেছেন আপনি।'

কথাটা বলেই চমকে গেল মৃণাল। এই ঘরে, জ্যোতির স্মৃতিচিহ্নর সামনে এমন লঘু কৌতুকের গলায় কথা বলল সে? বলতে পারল?

মৃণাল নিজেকে সামলে নিল। ভাবল, তাতে কি! জ্যোতি তো মারা যায়নি, জ্যোতি শুধু হারিয়ে গেছে। তাকে আমি খুঁজে বার করব।

এখন, জ্যোতি এইখানে নেই বলে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা করব না?

কিন্তু মালবিকা বিপন্ন দৃষ্টিতে তাকায়। 'নিজেই বলেছি আমি?'

'বলেননি? বাঃ। মনে করে দেখুন। বলেননি পূর্বজন্মে আপনার কাছ থেকে মোটা টাকা ধার নিয়ে শোধ দিইনি?'

মালবিকা হেসে উঠল না। শুধু হাসল।

তাই পাশের ঘর থেকে শোনা গেল না। আর হয়তো তাই মৃণালও হেসে উঠল না, শুধু মুখটা হাসির মতো হালকা দেখাল।

মালবিকা বলল, 'আপনার স্মৃতিশক্তি তো বেশ।'

'আপনারও কম নয়। জন্ম-জন্মান্তর পর্যন্ত মুখস্থ।'

এবার হেসে না উঠে পারে না। দু'জনেই।

এ-ঘরে লীলাবতী স্যুটকেস গোছাতে গোছাতে ভক্তিভূষণের দিকে তাকান।

বলেন, 'চিরকাল বলেই এসেছি, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে, এখন সেটা অনুভব করছি।'

ভক্তিভূষণ মৃদু গলায় বলেন, 'কম বয়সের মন স্রোতস্বিনী নদীর মতো!'

ভগবানের সব কাজই মঙ্গলের, এ মতবাদে তাঁর সমর্থন আছে কিনা বোঝা যায় না। তারপর বলেন, 'নিজেদের দায়িত্বে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখনো জানা গেল না মেয়েটার হিস্ট্রি কি?'

লীলাবতী অসন্তুষ্ট গলায় বলেন, 'শুনলেই তো গোপালের মা'র মুখে।'

'সেটা নিশ্চিত নয়। কী অবস্থায় ও-ভাবে—'

লীলাবতী হাতের কাজ থামিয়ে স্থির হয়ে বসেন। উদাসী গলায় বলেন, 'সে বিচার আর আমরা করতে যাব কোন্ মুখে?'

॥ ২৭ ॥

কিন্তু ক্রমশঃ সবই জানা হয় বৈকি। উভয়ে উভয়কে জানে।

মালবিকা জানতে পারে সেই ভয়ঙ্কর দিনে, যখন মালবিকা দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে গ্রামের ও-প্রান্ত থেকে এ-প্রান্তে ছুটে আসছিল শিকারীর হাত-ফসকানো ভয়ার্ত পশুর মতো, ঠিক তখনি

এদের বাড়ির প্রাণপাখীটি কবলিত হয়ে গেল শিকারীর অব্যর্থ মুষ্টিতে।

এরা চলে যাচ্ছিল, পরাজয়ের চাদবে মুখ ঢেকে, মালবিকা এসে ওদের আটকে ফেলেছে। তারপর ওরা ওদের ওই হাহাকার-করা শূন্যতায় মালবিকাকে পেয়েই বর্তে গেছে।

মালবিকা সেই শূন্যতাব গহ্বরের সামনে একটা পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে যেন।

মাঝে মাঝেই বাতাসে উড়ে যাচ্ছে বটে সেই পর্দা, সেই শূন্যতা দাঁত খিঁচিয়ে গ্রাস করতে আসছে, তবু সেটা আবার স্থিব হচ্ছে, আবাব ঢাকা পড়ছে। মালবিকা জানতে পাবে, 'জ্যোতি' নামের সেই ভাগ্যেব মার-খাওয়া মেয়েটারও তারই মতো না আছে মা, না আছে বাপ। যারা বিয়ে দিয়ে কাজ সেরেছে, সেই দাদা-বৌদি ওকে ভুলে থাকতে পেলেই সুখী।...অতএব জ্যোতি এই ছোট্ট সংসাবটুকুব মধ্যেই আপন জ্যোতির্ময় পবিমণ্ডল বচনা কবে নিয়ে আলোক বিকীর্ণ কবছিল। এখন তলিয়ে গেছে অন্ধকারে।

এরা জানতে পাবে মালবিকা নামের ওই মিষ্টি চেহারার তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাতৃপিতৃহীন মেয়েটি একদা কাকা-কাকীব উপব অভিমান করে শ্রীহট্ট থেকে চলে এসেছিল কলকাতায়। বিনা সম্বলে। বয়েস ছিল মাত্র সতেরো।

তারপর কেবলমাত্র নিজেব চেষ্টায় কলকাতা শহরে থেকেছে, পড়েছে, বি.এ., বি টি. পাস করেছে এবং এখানে সেখানে অনেকখানে কপাল ঠুকতে ঠুকতে নিতান্তই 'কিছু না কবি বেগার খাটি' গোছ মনোভাব নিয়ে বিভক্ত দেশের সীমান্তরেখায় ওই কাজটায় লেগেছিল।

বেশীদিন নয়, মাত্র মাস দেড়েক। ইত্যবসরে একমনে কর্মখালির বিজ্ঞাপনও দেখে যাচ্ছে এবং পত্রাঘাতও করে যাচ্ছে।

আরো জানল এরা, সেই দুর্দিনে ও শুধু ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে ছুটে ছুটেই আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল সেদিন। সেই ছোটায় তার কাপড় ছিঁড়েছিল, ঘড়ি পড়ে গিয়েছিল, চশমা খসেছিল, আর শেষ পর্যন্ত ওই বড় বাড়ির ভাঙা দেওয়ালটার অন্তরালে আশ্রয় নিয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল। পড়েছিল সেই অবস্থায় পুরো দুটো দিন।

মালবিকার ঘটনাটা এদের কাছে নতুন মনে হলো না, সবটাই প্রায় অনুমানে জানা হয়ে গিয়েছিল। তবে নিশ্চিত হলো। কিন্তু কবে এসব জানাজানি হলো ?

এরা কি তবে কলকাতায় গেল না ?

এরা কি এইখানেই রয়ে গেল মালবিকা মিত্রকে জ্যোতির্ময়ী ঘোষ সাজিয়ে ? ভাবল, কলকাতার সমাজ আরো পরিচিত, আর পরিচিত বলেই ভয়ঙ্কর! তার থেকে এই বহু পুরনো বিরাট প্রাসাদটার ভারী ভারী দেওয়ালের অন্তরালে মুখ ঢেকে—

দূর, তাই কি হয় ?

ভক্তিভূষণ কি ঘোড়ার গাড়িকে বলে রাখেননি ?

সে গাড়ি কি ঠিক সময় এসে ভোরের আলো ফোটবার আগেই স্টেশনে পৌঁছে দেয়নি ঘোষেদের বাড়ির চারটে মানুষকে ? যার মধ্যে একজন 'সদ্য জ্বর থেকে ওঠা' দুর্বল। 'বৌমার জ্বর' এই কথাই তো বলেছেন ক'দিন লীলাবতী। অকারণেই একে-ওকে ডেকে ডেকে বলেছেন।

গ্রামে গাড়িব গাড়োয়ানরাও আত্মীয়তার সুরে কথা বলে।

তাই গাড়োয়ান বংশী বলেছিল, 'আর ক'টা দিন থেকে গেলে হতো বাবু! বৌমার যেক্ষেত্রে এত শরীর খারাপ—'

ভক্তিভূষণ তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলেন, 'ছেলের ছুটি ফুরিয়ে গেল—'

তারপর মুখ ফিরিয়ে লীলাবতীকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন সুউচ্চ স্বরে, 'ভাল করে ঢেকে বসতে বলো, ভোরের ঠাণ্ডা—'

বংশী ইতিপূর্বে কোনোদিন এঁদের দেখেনি, হয়তো দেখেনি সরকারি স্কুলের সদ্য-আসা দিদিমণিকে, তথাপি ভক্তিভূষণ সাবধান করছিলেন।

সব হাহাকার চাপা পড়ে গিয়েছিল ভক্তিভূষণের ওই আত্মরক্ষার তাড়নায়।

হয়তো বা সকলেরই তাই হচ্ছিল।

মৃত্যুভয়ের পরেই তো লোকভয়।

মৃণালও আসবার সময় ওই সামলানোটার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল, তবে সেটা আবার কতকটা ওই ছদ্মবেশিনীর দুর্বল অবস্থাটা স্মরণ করে।

'আপনি নিজেকে একটু ঢেকেঢুকে নিন, জোলো জোলো হাওয়া বইছে।'

তা নিজেকে ঢেকে নেবার গরজ কি ছদ্মবেশিনীর নিজেরই ছিল না? সেও তো আত্মগোপনের পথ ধরেই পালাতে চেয়েছিল। নইলে আবার তো তাকে ওই 'সরকারি শিক্ষণ-কেন্দ্রে' গিয়ে জুড়তে হতো? সরকারের বদান্যতায় ট্রেনিং নিয়ে পাস করেছে যখন। ছ'মাসের চুক্তি, বণ্ডে সই করে আসা!

কিন্তু স্টেশনে এসে মৃণাল হঠাৎ যেন দূর আকাশের তারা হয়ে গেল। মনে হলো মৃণাল এদের দলের নয়।

চারখানা টিকিট কেটে, তিনখানা বাপের হাতে দিয়ে বাকিটা নিজের পকেটে পুরে বলল, 'আমি পাশের কামরায় আছি।'

পাশের কামরায়!

পাশের কামরায় কেন?

লীলাবতী ভয় পেলেন।

লীলাবতীর মনে হলো মৃণালের বুঝি ভয়ঙ্কর কোনো অভিসন্ধি আছে। হয়তো মা-বাপকে কলকাতার গাড়িতে তুলিয়ে দেবার অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে ছিল এ কয়দিন।

'পাশের গাড়িতে আছি' বলে হারিয়ে যাবে।

লীলাবতী ব্যাকুল গলায় বললেন, 'কেন? পাশের গাড়িতে কেন?'

'আমার সেটাই সুবিধে,' বলল মৃণাল নির্লিপ্ত গলায়।

'এখানেই বা তোর কী অসুবিধে?' লীলাবতীর স্বর আরো ব্যাকুল।

হঠাৎ ভক্তিভূষণ ধমক দিয়ে উঠলেন, বলে উঠলেন, 'আঃ! সব সময়ই বা তুমি ওকে অত জবরদস্তি কর কেন? ওর যেখানে সুবিধে বসুক না।'

মনে হলো যেন মৃণালের এই পাশের কামরার সিদ্ধান্তে খুশিই হলেন তিনি।

লীলাবতী সেটা টের পেলেন। তাই চুপ করে গেলেন। শুধু তাঁর প্রাণটা আকুলি-বিকুলি করতে লাগল পরের স্টেশন আসবার অপেক্ষায়।

গাড়ি থামলে নেমে গিয়ে দেখবেন তিনি।

আশ্চর্য, বাপের প্রাণে কি ভয় থাকে না?

ভক্তিভূষণ কেন ভাবছেন না মৃণাল এই সুযোগে হারিয়ে যেতে পারে, তার সেই হারানো বৌকে খুঁজতে?

কিন্তু পরের স্টেশনে লীলাবতীকে নামতে হলো না, মৃণাল নিজেই এসে জিজ্ঞেস করে গেল কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা। ছুটো স্টেশন পরে আবার।

ভয় ভাঙল আস্তে আস্তে। ভোরের গাড়ি জনবিরল, লীলাবতী ভক্তিভূষণের কান বাঁচিয়ে মালবিকার কাছে প্রকাশ করতে বসলেন, কেন তার ছেলেকে নিয়ে এত ভয়।

প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়েও অতঃপর মালবিকার ইতিহাসটাও হলো প্রকাশিত।

॥ ২৮ ॥

'ও কি সবটা সত্যি বলেছে?' প্রশ্ন তুলেছিলেন ভক্তিভূষণ। ক'দিন যেন পরে।

লীলাবতী বিরক্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'মিথ্যে হলে এ ইতিহাস হতো না। বাঘের কবল থেকে কে কবে ফিরে আসতে পারে? তা পারলে—'

থেমে গিয়েছিলেন। চোখ মুছেছিলেন।

চোখটা অসম্ভব পানসে হয়ে গেছে লীলাবতীর, আর মনটা অসম্ভব দুর্বল। সবসময় যেন অসহায়তা অনুভব করেন। জ্যোতি এ সংসারের সবখানি জুড়ে ছিল, জ্যোতি এ-সংসারকে তার ভালবাসার হাতে তুলে নিয়েছিল। লীলাবতী নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে বসেছিলেন ক্রমশঃ।

তাই এখন এই শূন্য সংসারের চেহারা চিন্তা করে আঁকড়াতে চাইছেন মেয়েটাকে। ছাড়তে চাইছেন না কিছুতেই। নইলে কলকাতায় এসে স্টেশনে নেমেই তো বলেছিল ও, 'মা, এইবার আমায় বিদায় দিন।'

মা! মা ডাকতে শেখাল কে ওকে?

লীলাবতী কিন্তু এ ডাক শুনে ধিক্কার দিয়েছিলেন ওকে। ধিক্কার দিয়েছিলেন, 'মা' ডেকে বিদায় চাওয়ার জন্যে। প্রশ্ন তুলেছিলেন মালবিকার হৃদয় নামক বস্তুটা আছে কিনা, তাতে মায়া-দয়া বস্তুটা বর্তমান কিনা। তারপর বলেছিলেন, কিছুতেই এখন ছাড়বেন না তিনি। ভগবান তাঁকে বড় দুঃসময়ে মিলিয়ে দিয়েছেন। 'এই দুঃসময়ে তুমি আমায় ছেড়ে যাবে?'

'চলুন, চলুন এখন।' গলা নামিয়ে বলেছিল মৃণাল।

অনুভব করতে পেরেছিল লীলাবতীর ভিতরের কথা। বুঝেছিল সর্বত্র জ্যোতির চিহ্ন ছড়ানো এই বন্ধ বাড়িটায় চাবি খুলে ঢুকতে ভয় পাচ্ছিলেন লীলাবতী। সাহস পাচ্ছিলেন না জ্যোতির হাতে নতুন করে আঁকা নিজের সংসারটায় ঘুরতে। টের তো পাচ্ছেন, স্বামীপুত্র তাঁর এই ভয়ে ভরসা দিতে আসবে না, এই নিঃসঙ্গতায় সঙ্গ দিতে পারবে না। এখানে তিনি অসহায় হয়ে পড়ে থাকবেন।

বরং ওদেরই ভার নিতে হবে লীলাবতীকে।

আর সে ভার বড় কম নয়। প্রিয়বিচ্ছেদকাতর শোকাহত হৃদয়ের তুল্য ভারী ভার আর কি আছে জগতে?

মালবিকা লীলাবতীর সেই ভার কিছুটা হালকা করে দিতে পারবে। মালবিকা সে প্রতিশ্রুতি এনেছে। মালবিকা যেন সে স্বাক্ষর রাখছে।

আর তাকে ছাড়েন লীলাবতী? বলবেন না জড়িয়ে ধরে, 'কেমন তুই চলে যাস দেখি?' বলবেন না, 'আমার মেয়ে নেই, তুই আমার মেয়ে?'

॥ ২৯ ॥

এসব কলকাতায় আসার পর।

যখন ট্রেনে জ্যোতির শাড়ি-জামা পরা মেয়েটাকে দেখছিল আর চমকাচ্ছিল মৃণাল, যখন দেখে অবাক হচ্ছিল, জ্যোতির গায়ের জামা একেবারে ফিট করেছে ওর গায়ে, আর যখন বারে বারে মনে হচ্ছিল জ্যোতির সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে এর, তখনো নয়।

তখনো দূরত্ব রেখে 'তুমি' করেই কথা বলছিলেন লীলাবতী। আর ভক্তিভূষণকে ফিসফিস করে বলছিলেন, 'আড়াটা ঠিক তার

মতো।' বলছিলেন, 'ঘুরছে ফিরছে, চমকে চমকে উঠছি আমি। অনেকটা আদল আছে তার সঙ্গে।' বলছিলেন, 'আমি সাহস করে বলতে পারছিলাম না, মৃণাল বললে তাই। কি-রকম মানিয়েছে দেখেছ? কে বলবে ওর নিজের জামা-কাপড় নয়।'

কাপড় বস্তুটা যে নিতান্তই অকৃতজ্ঞ, ও যখন যার তখন তার, সেকথা ভাবেননি। অবাক হয়েছিলেন। চমকে চমকে উঠছিলেন, তবু চমকাতে ভাল লাগছিল যেন। যেন সহসা মনে করতে পারবেন, জ্যোতি আছে। লীলাবতীর ধারে-কাছে তার আঁচলের আভাস।

দূরত্ব গেল শেয়ালদা স্টেশনে নেমে।

যখন মালবিকা বলল, 'এবার তবে আপনারা ছুটি দিন? এখানে কাছে একটা মেয়ে হোস্টেলে আমার এক সহপাঠিনী থাকে—'

তখন লীলাবতী বললেন, 'তার মানে আমার বাড়িতে আর জলগ্রহণ করবি না?'

হ্যাঁ, তখনি সেই হাত-পা হিম-করা ভয়টা চেপে ধরেছিল লীলাবতীকে। তাই বলেছিলেন। 'আমার মেয়ে নেই, তুই আমার মেয়ে।' সেই 'তুই' শুরু।

আর মালবিকা ভেবেছিল, 'কত মহৎ ইনি!'

তবু কুণ্ঠিত হয়েছিল, তবু বলেছিল, 'ভুগলেন তো আমাকে নিয়ে অনেক—'

'তার মানে পর ভাবছিস?'

'কিন্তু—'

'আর কিন্তু দেখাসনে বাছা, এখনো তোর হাতে-পায়ে বল হয়নি, এখনো মুখ পাণ্ডাস, আর বলছিস কিনা হোস্টেলে থাকব। কেন, কেউ কোথাও তো নেই তোর যে রাগ করবে! আমাকে 'মা' ডাকলি, থাক আমার কাছে। এখানেই একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিয়ে রয়ে যা। বিদেশ-বিভুঁয়ে যেতে হবে না।'

মালবিকা হেসে ফেলেছিল, 'তাহলে আপনার কাছে করিই চাকরি। আর চাকরি দিচ্ছে কে?'

'ঠিক আছে। তাই কর। আমার মেয়ের পোস্টটা দখল করে থাক—এই চাকরি।'

লীলাবতী কি এত ভাবপ্রবণ ছিলেন আগে? এমন আতিশয্যপূর্ণ কথা বলেছেন কখনো?

বোধহয় না। জ্যোতির দুর্ভাগ্য তাঁর প্রকৃতি বদলে দিয়েছে যেন।

'থাকুন, থেকে যান।' মৃণাল গলা নামিয়ে বলে, 'চাকরিটা খারাপ নয়, ভবিষ্যৎ আছে।'

'ভবিষ্যৎ?'

'হুঁ। মা হয়তো এবার তাঁর অরক্ষণীয়া মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগবেন।'

'আপনি কি আমাকে ব্যঙ্গ করছেন?' বলেছিল মালবিকা।

মৃণাল আহত হয়েছিল, 'মাপ করবেন।'

মালবিকা চোখ তুলে তাকিয়েছিল, 'ও শব্দটা আমিই উচ্চারণ করছি।'

নিয়তির অমোঘ বিধানকে দেখা যাচ্ছিল না, তবু সে তার কাজ করে যাচ্ছিল। মালবিকা ভক্তিভূষণের পরিবারভুক্ত হয়ে তাঁদের ফ্ল্যাটে এসে উঠেছিল। তবু ভাবেনি, সত্যি থেকে যেতে হবে। মনে করেছিল আজকের দিনটা যাক, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাল যাওয়া যাবে।

কিন্তু গেল না। যেতে পারল না।

মৃণাল বলল, 'চশমাটা না করে যাওয়া চলে না। আমার প্রতিজ্ঞা আছে আপনাকে চক্ষুদান করবার। সেটা পালন করতে দিন।'

এমনি কৌতুকের সুরেই বরাবর কথা বলতে অভ্যস্ত মৃণাল মালবিকার জন্যে নতুন নয়।

কিন্তু এখন তো সে অভ্যাসের বদল হওয়া উচিত ছিল। জ্যোতিকে হারিয়েও পুরনো সুরে কথা কইবে সে? এটা তো অনিয়ম, এটা তো লজ্জার।

তা মাঝে মাঝে নিজেই চমকে যায় সে। লজ্জা পায়, তবু কেন কে জানে ঝলসে ওঠে পুরনো অভ্যাস।

কথা ওঠে কৌতুকে ঝলসে। এইজন্যই বুঝি প্রবাদের সৃষ্টি 'স্বভাব যায় না ম'লে'—মৃত্যুই তো ঘটে গেছে মৃণালের! অথচ স্বভাবটা রয়েছে।

যদিও আগের মতো সমস্ত মুখটায় আলো জ্বলে ওঠে না, যদিও আগের মতো চোখের তারা ঝকঝকে দেখায় না, তবু কথায় লাগছে পুরনো সুর।

এখানে দেশের বাড়ির সেই বুকচাপা ভাবটা নেই, এখানে অনেক ঘর আর অনেক দালান বারান্দার খাঁজ-খোঁজের হাহাকার করা শূন্যতা নেই। এখানে শুধু চেনা লোকের ভয়।

সে ভয়টা সর্বদার নয়।

সে ভয়টা শুধু দরজার কড়া নেড়ে উঠলে।

তাছাড়া অন্য সময় বলে ফেলা যায়—'আমার প্রতিজ্ঞা আছে আপনাকে চক্ষুদান করবার, সেটা পালন করতে দিন।'

এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করা সহজ নয়। 'চক্ষু'র অভাবে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় কাটাচ্ছে মালবিকা। এক লাইন পড়তে পারছে না! একটা সূক্ষ্ম কাজ করতে পারছে না। দেওয়ালে টাঙানো ফটোগুলোয় ঝাপসা চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে।

তা কৌতুক করে বলা কথার উত্তরটা নেহাত নীরস করে দেওয়া যায় না। তাই মালবিকাকেও বলতে হয়, 'কথা আছে জানেন তো, কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই? চক্ষু লাভের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আরো একটা দানের জন্যে হাত পাতবো।'

মৃণাল মৃদু হেসে বলে, 'কী সে বস্তুটি?'

মালবিকা মাথা নিচু করে বলে, 'বিদায় দান।'

মৃণাল সেই নিচু করা মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখে আস্তে বলে, 'সেটা আমার ডিপার্টমেন্ট নয়।'

'আপনার পক্ষ থেকেও তো দেবার আছে।'

'শুধু আমারটায় তো কাজ হবে না। শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর বিল থেকে 'পাশ' করে বার করে নিতে পারেন তো?'

'ওটা কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া হলো। আমি ফাইলটা আপনার টেবিলে আগে এনেছি—'

'কিন্তু আমি কে? আমি তো শুধু কেরানী। আমার 'সাইন' করবার রাইট-ই নেই।'

'অনেক ক্ষেত্রে কেরানীরাই আসল!'

'সেটা ঘুষের ক্ষেত্রে,' বলে হেসে ওঠে মৃণাল।

'যাদের ঘুষ দেবার ক্ষমতা নেই, তাদের মিনতিই সম্বল।'

মৃণাল একটু চুপ করে থেকে বলে, 'সত্যিই কি আপনার এখানটায় একেবারে অতিষ্ঠ লাগছে?'

কৌতুকের সুর ঝরে গিয়ে ভিতরের গাম্ভীর্য দেখা দেয়।

মালবিকাও অতএব গম্ভীর হয়, 'এ কথাটা যে আপনি একটা অর্থহীন কথা বললেন, তা আপনি আমার থেকেও বেশী জানেন।'

'তা হলে এত অস্থিরতা কেন?'

'কেন, সেটাই কি বোঝেন না?'

'উহুঁ।'

'আপনি ভয়ানক কথা এড়ান।'

'বাঃ, এতে এড়ানোর কি হলো?' আবার হালকা সুরে ফিরে আসে মৃণাল, 'আপনার মা নেই, মুফতে একটি মা পেয়েছেন। আর শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর মেয়ে নেই, কুড়িয়ে বাড়িয়ে একটি মেয়ে পেয়ে গেছেন, এর মাঝখানে অস্থিরতার প্রশ্ন কোথায়?'

'বুড়োধাড়ি একটা মেয়ে বেকার বসে বসে মা'র অন্ন ধ্বংসাব ?'

'ওঃ তাই ? তাই এত অস্থিরতা ?' মৃণাল বলে ওঠে, 'বেকার যে চিরদিন থাকবেন তা তো নয়। যে ক'টা দিন আছেন—না হয় ধ্বংসালেনই ছটাকখানেক করে অন্ন। চালের মাপে শূন্যস্থান পূরণে লীলাবতী দেবীর হৃদয়ের শূন্যতাটা কিঞ্চিৎ—'

হঠাৎ চুপ করে যায় মৃণাল।

যেন মনে হয় অসতর্কে পাহাড়ী রাস্তায় হঠাৎ খাদের ধারে গিয়ে পড়েছিল, সামলে নিল নিজেকে।

মালবিকাও ওই অসমাপ্ত কথাটার গভীর ব্যঞ্জনায় মূক হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে বলল, 'বেশ, আমাকে একটা চাকরিই খুঁজে দিন।'

'চাকরি খোঁজা এত সহজ বুঝি ?' মৃণাল হেসে উঠে বলে, 'ওই ভয়েই তো প্রাণ মান সব গেলেও চাকরিটি আঁকড়ে বসে থাকতে হয়। মনে হয়েছিল বুঝি জীবনে আর সেই গতানুগতিক ছকে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারব না। এই তো অফিসে জয়েন করলাম।'

ভিতরে ভিতরে দু'পক্ষই দু'পক্ষকে জেনেছে, তাই ইঙ্গিতেও কাজ চলে। আর তাই কথার মধ্যে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলে। কখনো স্বভাবের রোদ্দুর ঝকঝকিয়ে ওঠে। কখনো হৃদয়ের অন্ধকার মেঘ হয়ে সে রোদ্দুরকে ঢেকে দেয়।

মালবিকা মৃদু গলায় বলল, 'কাজ তো করতেই হবে। কাজ না হলে বাঁচবেন কি করে ?'

'সেটা দুটো অর্থেই। বিষণ্ণ হাসি হাসল মৃণাল, 'মানুষ এমন একটা জীব, তার সমস্ত অভাব সয়ে যায়, সয় না কেবল খাওয়ার অভাব। আর সমস্ত রকম অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও সেটার ব্যবস্থা করে ফেলে।'

মালবিকা মৃদু হেসে বলে, 'সেটা আমি হাড়ে হাড়ে জানি।

বছর সতেরো বয়স, হাতে পয়সার বালাই নেই, চলে আসছি শ্রীহট্ট থেকে কোলকাতায়, অথচ খাওয়াটা ঠিক জুটিয়ে নিলাম, বেঁচেও গেলাম। আবার এখনো দেখুন—হাতে নেই কানা-কড়ি, অথচ দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি, সুখে স্বচ্ছন্দে লালিত হচ্ছি—'

'স্বচ্ছন্দে আর কই?' মৃণাল হেসে ওঠে, 'অস্বচ্ছন্দের কাঁটা প্রাণে বিঁধিয়ে বসে আছেন, আর ভাবছেন কেমন করে এ কণ্টক উৎপাটিত করা যায়, এই তো।'

'বাঃ তাই বলে—'

'না, বাঃ তাই বলে কিছু নেই, আমরা তো বিনা দ্বিধায় আপনার স্নেহ-যত্ন সেবা গ্রহণ করছি! আমরা তো লজ্জিত হচ্ছি না, কুণ্ঠিত হচ্ছি না—'

'আহা, ভারী একেবারে সেবা-যত্ন—' মালবিকা লালচে হয়ে ওঠে।

মৃণাল সেই দিকে তাকিয়ে গভীর স্বরে বলে, 'আমাদের কাছে যে সেটা কতখানি, তা আপনাকে বোঝাতে পারব না মিস মিত্র! আমার কতখানি বোঝা যে আপনি হালকা করে দিয়েছেন! বাবা মা, এঁদের নিয়ে আমি যে কী করতাম! কিন্তু যাক—কথায় কথায় আসল কথাটাই চাপা পড়েছে, কাল সকাল সাড়ে আটটার সময় তৈরি থাকবেন, আমি আপনাকে নিয়ে যাব।'

'নিয়ে যাবেন? কোথায়?'

'বাঃ, সব ভুলে মেরে দিলেন? চোখটা দেখাতে হবে না?'

'দেখুন, সত্যি, অনর্থক এই খরচা, অথচ বেশী দিন করিনি চশমাটা, প্রেসক্রিপশনও ছিল—'

মৃণাল হঠাৎ প্রায় বকুনির ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'ছিল? আশ্চর্য রকমের বেহুঁশ মহিলা তো আপনি! সেটা ফেলে রেখে এলেন? যখন ছুটতে শুরু করেছিলেন, তখন সঙ্গে নেবেন তো?'

মালবিকা প্রথমটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিল, তারপর হেসে ফেলল।

সেই হাসির দিকে তাকিয়ে মৃণালের মনে হলো, সব মেয়েরই কি একই ভঙ্গি ?

মৃণাল তারপর বলল, 'আমার একসময় খুব দুঃখ ছিল, বুঝলেন ? ভাবতাম, আঃ, এত লোকের চোখ খারাপ হয়, আমার একটু হয় না ?'

'তারপর ? যখন হলো ? খুব আহ্লাদ হলো তো ?'

'তাই কি হয় ?' মৃণাল মৃদু হেসে বলে, 'অপ্রাপ্যের জন্যেই তো ছটফটানি মানুষের। পেয়ে গেলে আর কি ? কিছুই না। মনেও থাকে না।'

মালবিকা অন্য কিছু ভেবে বলেনি, মালবিকা ওই চশমা প্রসঙ্গেই বলল, 'আবার মনে পড়ে হারালে। হাড়ে হাড়ে মনে পড়ে, তাই না ?'

বলেই চুপ করে যায় মালবিকা।

মালবিকার মনে হয়, প্রসঙ্গটা যারই হোক—অন্য খাতে বয়ে যাচ্ছে বুঝি।

মৃণাল সেটা বুঝতে পারল।

মৃণালের মনে হলো মালবিকা অপ্রতিভ হয়েছে। অতএব মৃণাল সেই অন্য খাতটার দিকে না দেখতে পাওয়ার ভান করল। মৃণাল মুখে হাসি এনে বলল, 'তা আর বলতে ? বিশেষ করে ঘড়ি, পেন, পার্স, চশমা। না হারালে বোঝাই যায় না 'ছিল'।'

মালবিকা একটু চপল হলো।

মালবিকা ওই দীর্ঘায়ত দেহটার দিকে তাকিয়ে একটু বুঝি চঞ্চল হলো, হেসে বলল, 'আরো একটা জিনিস আছে যেটা হারালে তবে টের পাওয়া যায় 'ছিল'।'

মৃণাল ওর ঈষৎ চপল হাসির দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল, 'থাক, সব জায়গায় সব জিনিসের নাম করতে নেই। অপদেবতায় পায়।'

'অপদেবতা!'

'হ্যাঁ। জানেন না?' মৃণাল দিব্য গম্ভীর গলায় বলে, 'অপদেবতারা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর যে যখন যা কথা বলে, ফাঁক পেলেই তার মধ্যে ঢুকে পড়ে।'

'আপনি এসব বিশ্বাস করেন?' মালবিকা ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে।

মৃণাল বলে, 'করব না? বলেন কি? বরং দেবতা না মানবো, তা'বলে অপদেবতা? ওরে বাবা! না মানলে ঘাড় মটকে দেবে না?'

বলে হাসতে থাকে। এই স্বভাব মৃণালের।

মৃণালের জীবনে অতবড় একটা পরিবর্তন এল, তবু স্বভাবটার তেমন পরিবর্তন হচ্ছে না। না কি আর এক পরিস্থিতি তাকে পরিবর্তিত হতে দিচ্ছে না?

বলতে গেলে, কুটুম্বের মতো এই যে একটা মানুষ বাড়িতে রয়েছে, তার সঙ্গে কিছু ভদ্রতা, কিছু সৌজন্য, কিছুটা হাস্য-পরিহাস দরকার বৈকি। তা না হলে কেমন দেখাবে?

জোর করে রাখা হচ্ছে তাকে, অথচ অবহেলা দেখাবে? ছিঃ!

অথচ লীলাবতীর স্বভাব কেমন বদলাচ্ছে। তিনি যেন বুঝেও অবুঝ হচ্ছেন। ধীর-স্থির ছিলেন, আবেগপ্রবণ হচ্ছেন, হিসেবী ছিলেন, বেহিসেবী হচ্ছেন। বেহিসেবী হচ্ছেন অর্থ—অনর্থে।

লীলাবতীর ছেলেটা মন-মরা হয়ে থাকে বলে, লীলাবতী ছুতোয়-নাতায় তার সামনে এগিয়ে দেন তাঁর পাতানো মেয়েটিকে। লীলাবতীর সেই পাতানো মেয়েটা নিঃসম্বল হয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছিল বলে, লীলাবতী যখন-তখন তার জন্যে কিনে আনেন প্রয়োজনীয় বস্তুর সম্ভার।

আর সে প্রতিবাদ করলেই বলে ওঠেন, 'তার মানে তুই আমায় পর ভাবিস?'

সবটাই বেহিসেবী কাণ্ড!

কিন্তু ভক্তিভূষণ? তিনি অবশ্যই আপন কেন্দ্রে স্থির।

তিনি ওই পাতানো মেয়েটাকে ভালবাসলেও এটা ভালবাসেন না, কারণে অকারণে সে তাঁর বিরহতপ্ত ছেলেকে সান্নিধ্য দিতে যাক। তিনি ওই মেয়েটিকে পুরো অবিশ্বাস না করলেও ভাবেন, বিশ্বাস কি? হয়তো সব কথা সঠিক নয়, হয়তো কিছুটা বানানো। কে জানে কাকা-কাকীর উপর অভিমান করে চলে এসেছিল, না কি আর কিছু?

সত্যিই কুমারী, না বালবিধবা, না আরো কিছু। একথাও ভাবেন মাঝে মাঝে, তবু আস্তে আস্তে তাকে ভালও বাসতে শুরু করেন অন্তরের সঙ্গে।

মেয়েটির স্বভাবটি নম্র, হাসিটি মিষ্টি, বুদ্ধিটা মার্জিত। প্রশ্রয় দিলেও নেয় না, সুযোগ দিলেও সহজে সুযোগ গ্রহণ করে না। এটা কম গুণ নয়।

জ্যোতির সঙ্গে স্বভাবের তফাত আছে। জ্যোতি ছিল প্রবলা, এ মৃদু।

দু'জনের অবস্থার তারতম্যটা মনে পড়ে না ভক্তিভূষণের। আর একথাও ভাবেন না, জ্যোতির সঙ্গেই বা তুলনা করতে যাচ্ছি কেন আমি?

॥ ৩০ ॥

তা' এ ভুল আরো দু'জনও করে। প্রতি পদে জ্যোতির সঙ্গে মনে মনে তুলনা করে। কিন্তু ভাবে না, জ্যোতির সঙ্গেই বা ওর তুলনা করতে যাচ্ছি কেন?

তুলনা করে, হয়তো লীলাবতীর ওই পাতানো মেয়েটার 'আড়া' জ্যোতির মতো বলে। হয়তো ওর হাসিটা জ্যোতির মতো বলে। হয়তো জ্যোতির কাজগুলো ও করছে বলে, জ্যোতির

জায়গাগুলোয় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে বলে। আর হয়তো বা জ্যোতির সঙ্গে একবয়সী বলে।

জ্যোতির কাজগুলো আস্তে আস্তে ওর হাতে চলে যাচ্ছে একথা সত্যি।

জ্যোতি হৈ-চৈ করে করত, মালবিকা নিঃশব্দে করে, তবু করে সব। কেমন করে যে বুঝে নিতে পেরেছে, কেমন করে যে হাতে তুলে নিয়েছে! এই মেয়ের সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রাখবে না মৃণাল? বাইরের একজন ভদ্রমহিলা তাদের সংসারে কাজ করবেন, ও কুণ্ঠিত হবে না? আর সেই কুণ্ঠা ঢাকতে কথার মধ্যে কৌতুকরস এনে সহজ হবে না?

আবার মালবিকার পক্ষেও রয়েছে কথা। এতটা যারা দিচ্ছে তাকে, তাদের কাছে কৃতজ্ঞ হবে না?

আর কার কাছেই বা কৃতজ্ঞ হবে, মৃণাল ছাড়া? ভক্তিভূষণ দূরের মানুষ, লীলাবতী নিতান্ত কাছের মানুষ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অসুবিধে।

অতএব এদের দু'জনের মধ্যেই ভদ্রতা আর কৃতজ্ঞতার পালা চলে।

কিন্তু সত্যিই কি মালবিকা বরাবরের জন্যে রয়ে গেল এ বাড়িতে?

তা, দেখা যাচ্ছে তো রয়েই গেল।

আচ্ছা, কোন্ পরিচয়ে?

পরিচয় নেই। ওই 'ভগবানের দান' এই পরিচয়ে। লোকে ভাবে সভ্য পরিচারিকা। বৌ গেছে, একটা মানুষ তো দরকার। তাই জোগাড় করেছে। কিন্তু জোগাড় করল কি করে? ওই ভগবান! সত্যমিথ্যায় জড়িত হয়ে একটা সংবাদ এদের আত্মীয়-বন্ধুর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে—ক'দিনের জন্যে দেশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে এদের সেই বড় আদরের বৌটিকে হারিয়ে এসেছে এরা। জেনেছে, তবে অস্পষ্ট। কি করে হারাল? বলছে না এরা।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে যেভাবেই প্রশ্ন করুক, লীলাবতী বলেন, 'ভগবান কেড়ে নিয়েছেন!'···অথচ অন্য সন্দেহ মনে আসবার নয়, দেখেছে তো সবাই জ্যোতিকে। স্বামীতে তদ্গত!

'তবে? কি হয়েছিল?'

'জিজ্ঞেস করো না ভাই, সহ্য করতে পারি না। বলতে পারি না।'

'পুকুরের দিকে গিয়েছিল বুঝি তবে?' জিজ্ঞেস করে কর্তাকে।

ভক্তিভূষণ কপালে হাত ঠেকান। অতএব পুকুরের দিকেই।

মৃণাল আবার কাজে যোগ দিল। সহকর্মীরা শুনল, ছুটির মধ্যে মৃণাল ঘোষের স্ত্রী মারা গেছেন। স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।

এতবড় অভাবনীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্প করতে আসতে সাহস পেল না কেউ। শান্ত বিষণ্ণ গম্ভীর মৃণাল যথারীতি আসা-যাওয়া করতে লাগল। ওরা বলল, 'কী ভয়ানক বদলে গেছেন!' বাইরের লোক তাই বলল।

যাওয়া-আসা করতে লাগল মালবিকাও। কাছেই একটা মেয়েদের স্কুলে কাজ করতে ধরেছে সে। স্থায়ী নয়, অস্থায়ী। তবু করছে।

মৃণাল বলেছিল, 'কেন নিচ্ছেন ও কাজ? ভারী তো স্কুল, তাও আবার অস্থায়ী!'

মালবিকা মৃদু হেসেছিল, 'জীবনের কোনটাই বা স্থায়ী?'

মৃণাল মাথা নিচু করেছিল।

॥ ৩১ ॥

মাথা নিচু করবেই। ধ্রুব সত্যের সামনে মাথা নিচু করা ছাড়া উপায় কি? কোনো কিছুই স্থায়ী নয়, এর চাইতে ধ্রুববাক্য আর কি আছে? কিন্তু 'সত্য' বস্তুটা বড় ভয়ঙ্কর।

সে খোলা তলোয়ারের মতো, দুপুরের সূর্যের মতো, জ্বলন্ত আগুনের মতো।

তাই হঠাৎ সে খোলা চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে সহ্য করা কঠিন।

মৃণাল যেন মালবিকার ওই সাধারণ কথাটার মধ্যেই সেই অগ্নি-স্পর্শ অনুভব করল।

স্থায়ী নয়, কিছুই স্থায়ী নয়।

বস্তু নয়, দৃশ্য নয়, কাল নয়, জীবন নয়, শোক নয়, প্রেম নয়। তা নইলে আমি আবার হাসছি, গল্প করছি, খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, পাট-ভাঙা স্যুট পরে অফিস যাচ্ছি। আমার দৈনন্দিন জীবনের কোনোখানে কোনো ছন্দপতন নেই!

শুধু আমি আমার কর্মস্থলে খুব শান্ত আর স্তব্ধ হয়ে থাকি, হাসি না, কথা বলি না। সেটা পারি না বলে নয়, ভয় পাই বলে।

আমি আমার মুখের উপরকার ওই বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের আবরণটা একটু সরিয়ে ফেললেই তো ওরা আমাকে পেড়ে ফেলবে, আর অন্তরঙ্গের গলায় প্রশ্ন করতে বসবে।

'কী হয়েছিল বলুন তো? হঠাৎ এমন হলো! আগে থেকে শরীর খারাপ ছিল? আশ্চর্য! মাত্র ক'টা দিনের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে—বেশী জ্বর হলো বুঝি? ডাক্তার পেলেন না সময়মতো? ক'দিন ভুগেছিলেন? কী মনে হলো? ম্যালেরিয়া?'

সুযোগ পেলেই এই প্রশ্নের ঝাঁক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা মৃণালের ওপর। ওদের মুখের রেখায় রেখায় মুখর হয়ে আছে ওই প্রশ্নগুলো। বুঝতে পারছে মৃণাল। তখন হয়তো মৃণালকে আবার ওই পুকুরের গল্প বানাতে হবে। যেটা সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য।

তাই মৃণাল নিজের মুখের আবরণটা একবারও অসতর্কে খসে পড়তে দিচ্ছে না।

জানে, শুধু ওইটুকুই নয়, ওই ঝাঁকের প্রশ্নগুলোর উত্তরেই তো আশ মিটবে না ওদের যে, গোঁজামিল চলবে। ওরা শুধোতে বসবে, ঠিক কোন্ অবস্থায়, ক'টা বেজে ক'মিনিটের সময় কী ভাবে কী হলো! তুলে আনার পর কী কী লক্ষণ প্রকাশ পেল, কী কী উপসর্গ দেখা দিল, ডাক্তার কি প্রেসক্রিপসান করল, ঠিক মতো ব্যবস্থা হলো কিনা, এগুলো নিখুঁৎ ভাবে শুনে অবহিত হতে চাইবে তারা।

যেন তাদের এক সহকর্মীর স্ত্রীর মৃত্যুকালের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ না শুনলে ভাত হজম হবে না তাদের।...তারপর—সান্ত্বনা দিতে বসবে।

এই ভয়েই স্বাভাবিক হতে পারছি না আমি, ভাবে মৃণাল। না হলে মাঝে মাঝেই তো কথা কয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়।

ভয় বাড়িতেও কিছু আছে বৈকি।

মা'র সামনে সহজ হতে হতে হঠাৎ কঠিন করে ফেলি আমি নিজেকে, ভাবল মৃণাল। পাছে মা ভাবেন আমি জ্যোতিকে ভুলে যাচ্ছি। পাছে মা মনে করেন আমার মধ্যে গভীরত্ব নেই।...আর—আর পাছে অন্য কিছু সন্দেহ করে বসেন।

তাই আমি যখন হঠাৎ কোনো রান্নার প্রশংসা করে বসি, যদি মা'র ওই পাতানো মেয়ের প্রতি ভালবাসার আতিশয্য দেখে কৌতুক করে হেসে উঠি, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শক্ত করে নিই, নিজেকে গম্ভীর আর মলিন করে নিই।

তার মানে আমি শোকের অভিনয় করে প্রমাণিত করতে চেষ্টা করি, জ্যোতিকে আমি ভুলে যাচ্ছি না।

হঠাৎ হঠাৎ ওই মেয়েটার ওপর ভারী রাগ আসে মৃণালের।

ওই মেয়েটাই আমার জীবনের শনি!

ও যেন কোন্ অদৃশ্য আকাশ থেকে ওর অশুভ ডানার ঝাপটায় জ্যোতিকে সরিয়ে দিয়ে নিজে এসে সেই শূন্য স্থানটার মধ্যে জেঁকে বসেছে।

যেন ওর আসা আর জ্যোতির হারিয়ে যাওয়া একটাই ঘটনা।

তারপর ও আস্তে আস্তে সব গ্রাস করছে।

আমার শোক, আমার শুভ্রতা, আমার প্রেম।

ও আমার সংসারটাকেও গ্রাস করে নিয়েছে।

আমার মাকে, আমার বাবাকে।

জ্যোতির জন্যে আর ওঁদের মনে এতটুকু শূন্যতা অবশিষ্ট নেই।

জ্যোতির কাজগুলো হাতে তুলে নিতে নিতে অলক্ষ্যে জ্যোতির আসনটাও দখল করে নিচ্ছে।

অথচ ওর বিরুদ্ধে বলবার কিছু পাচ্ছি না আমি। সেই আসনটা মালবিকা চুরি-ডাকাতি করে নিচ্ছে না, নিচ্ছে না জাল-জোচ্চুরি কি কৌশল করে। প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মে সে আসন আপনি এসে যাচ্ছে ওর অধিকারে।

অথচ আমি সেই অনিবার্যের দর্শক হয়ে বসে আছি, সেই অন্যায় দখলের প্রতিবাদ করছি না।

আমি পরমানন্দে দেখছি, লীলাবতীর শুধু উঠতে বসতে 'মালবি মালবি—'

'মালবি, আমার সেই কালোরঙের গরম চাদরটা কোথায় রে? মালবি, এবারে কি ধোবার বাড়ি থেকে আমার চওড়া সবুজ পাড়ের শাড়িটা এসেছে?...মালবি, মাছটা কি হবে বল তো, ঝাল না ঝোল?...মালবি, দুধ কি কিছু বেশী নেওয়া হবে, অনেকদিন পায়েস হয়নি।...মালবি, তোর আজকে ফিরতে একটু দেরি হবে বলছিলি না? বিকেলে কি কুটনো হবে বলে দিয়ে যাস্ বাপু!'

মালবিও সঙ্গে সঙ্গেই বলে, 'বিকেলের কুটনো আমি কুটে রেখেছি মা, খাবার ঘরের তাকে ঢাকা দেওয়া আছে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি এলেই রান্না হবে।' বলে, 'আজ আর পায়েস কেন মা? মাংস হচ্ছে। কাল হবে না হয়।' বলে, 'ঝাল তো বাবার সহ্য হয় না, মাছের ঝোলই হোক মা!'

হ্যাঁ, 'মা' আর 'বাবা'!

মা, মা, মা!

'সবুজ পাড়ের শাড়িটা তো গতবারেই এসেছে মা, আপনার আলমারিতে রেখেছি। কালো চাদরটা কাচতে পাঠিয়েছি, বলেছে দেরি হবে, দু-একটা রিপু করতে হবে।'

নিজে থেকেও বলে, 'মা, আজ আমার স্কুল নেই, প্রতিষ্ঠাতার জন্মদিবস। দোকানে যাবে বলছিলে না? আজ যাবে তো চল।··· মা, ছোটমাসীর অসুখ বললে, দেখতে যাবে তো যাও না, আমি সব ঠিক করে নেব।'

মাঝে মাঝেই লীলাবতীকে এখানে ওখানে বেড়াতে যাবার সুযোগ দেয়, 'আমি সব ঠিক করে নেব' বলে।

'ঠিক' অতএব হচ্ছে।

ভক্তিভূষণেরও সমর্পিত-প্রাণ অবস্থা। যেন বিরূপতা কেটে যাচ্ছে। এত বেশি হুঁশিয়ার মেয়েটা যে, ওর হাতে সমর্পিত-প্রাণ হওয়া ছাড়া উপায় থাকেনি।

ভক্তিভূষণ কখন কখন ওষুধ খান, সে-কথা ভক্তিভূষণ জানেন না, জানে মালবিকা। ভক্তিভূষণ কখন কোন্ কাপড়-জামাটা পরবেন সে নির্দেশ মালবিকার। ভক্তিভূষণ বর্ষার দিনে চান করবেন কি না, এবং গরমের দিনে কতটা জোরে পাখা চালাবেন, সে খবরদারির দায়িত্ব মালবিকারই।

জ্যোতি এতটা পারত না।

জ্যোতির সমস্ত চিন্তা-চেতনা হিল্লোলিত হতো আর একটি লক্ষ্যে। জ্যোতি 'কর্তব্য'র থেকে 'আনন্দ'কে প্রাধান্য দিত। তাই জ্যোতির কর্মনিষ্ঠা মাঝে মাঝেই স্থিরবিন্দু থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ত। বার্ধক্যের অসহিষ্ণুতা যেটা সহজে ক্ষমা করতে নারাজ।

তাই জ্যোতির সঙ্গে তুলনা বন্ধ হয় না।

আর মালবিকাই যেন সে তুলনায় অতুলনীয়া হয়ে ওঠে।

কর্মনিষ্ঠা বড় ভয়ানক হাতিয়ার! মন জয় করে নেবার পক্ষে এর মতো অস্ত্র অল্পই আছে।

কর্মনিষ্ঠা, অনন্যচিত্ততা, সংযম, ধৈর্য!

বয়স্ক মন এর কাছে আত্মসমর্পণ না করে পারে না।

তাই ভক্তিভূষণের বিরূপ মন আস্তে আস্তে বশ্যতা স্বীকার করছে।

ভক্তিভূষণ যখন মালবিকাকে তাঁর পারিবারিক সম্ভ্রম রক্ষার উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তখন বিরূপ ছিলেন না। তখন বরং যেন হাতে চাঁদ পেয়েছিলেন।

কিন্তু ভক্তিভূষণ ধারণা করেননি কলকাতায় এসে লীলাবতী এতখানি করে তুলবেন। যে মেয়ের জাতকুল কিছুই জানা নেই, নিজের পরিচয়পত্রে স্বাক্ষর করবার জন্যে যে নিজেই কলম হাতে নিয়েছে, ত্রিসীমানায় একটা আত্মীয়-বন্ধু দেখাবার ক্ষমতা যার নেই, তাকে একেবারে প্রাণের পুতুল করে তোলাটা বড় বেশী আতিশয্য ঠেকেছিল ভক্তিভূষণের।

আর নিতান্ত বিসদৃশ লেগেছিল মৃণালের কাছে ওই মেয়েটাকে এগিয়ে দেওয়া। লীলাবতী হয়তো তাঁর বিরহব্যথিত পুত্রের তাপিত চিত্তে একছিটে শীতলবারি নিক্ষেপ করতে একটা অসামাজিক কাজই করে বসছিলেন, কিন্তু ভক্তিভূষণ তাতে ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন।

পিতৃস্নেহ অনাবিল, পিতৃস্নেহ অতি-মাতৃস্নেহের মতো অনিষ্টকারী নয়।

আবার, যদি ভক্তিভূষণ ও ঘরে মৃণালের হঠাৎ হেসে ওঠার শব্দ পেতেন, রাগে জ্বলে যেতেন।

ভক্তিভূষণের মনে হতো ছেলেটা এত অপদার্থ? এত অসার? এত ভালবাসা ছিল, এত গলাগলি ছিল, দু'দিনে উড়ে গেল সব! ছি ছি! ওই মেয়েটাও ঘুঘু, কেমন তুকতাক করে মা ও ছেলেকে মুঠোয় পুরে ফেলছে। আমার সেই লক্ষ্মীপ্রতিমার জন্যে এতটুকু হাহাকার নেই কারুর মধ্যে!

ছি ছি!

অনবরত ওই ছি ছি।

গোড়ায় গোড়ায় মালবিকাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখলে জ্বলে যেতেন। বলতেন, 'নিজে বলেছে মিত্তির, তো মিত্তির? ভগবান জানেন! ওকে দিয়ে ভাত না রাঁধালে হবে না?···তোমার গতরে কী হলো?'

লীলাবতী অবশ্য এ অপমান সহ্য করে নিতেন না। লীলাবতী চাপা ক্রোধের সঙ্গে বলতেন, 'আমার গতরে আগুন লেগেছে। 'প্রাণ' বলে বস্তুটা থাকলে বুঝতে পারতে, কী হচ্ছে আমার ভেতর। আমার হাত পা উঠবে না আর।···ইচ্ছে হয় রাঁধুনী রাখো, ইচ্ছে হয় স্বপাক খাওগে। আমি ওর হাতেই খাব।'

'লোকে দেখলে বলবে বিনি মাইনের একটা রাঁধুনী পেয়ে গেছ—'

'লোকে বললে আমার গায়ে ফোসকা পড়বে না।'

'ও নিজেও ভাবতে পারে।'

'তোমার মতন কুটিল মন সবাইয়ের নয়।'

কিন্তু আস্তে আস্তে সেই কুটিল মন সরল হয়ে গেছে।

বিরূপ চিত্ত বিগলিত চিত্তে পরিণত হয়েছে।

আর এও লক্ষ্য করেছেন ভক্তিভূষণ, মেয়েটাকে যা ভেবেছিলেন, তা নয়।

একটা তরুণী মেয়ে আপন 'হৃদয়ে'র বালাই না রেখে শুধু একান্তচিত্তে সেবা করে যাচ্ছে, এ হেন দুর্লভ ঘটনাকে কতদিন অবহেলায় ঠেলে রাখা যায়?

ভক্তিভূষণের এখন উঠতে বসতে 'মা মা'!

মালবি নয়, শুধু 'মা'।

লীলাবতী এখন ওই উপলক্ষে সরস কথার স্রোত বহান।

'অ মালবি, দেখ তোর বুড়ো খোকা 'মা মা' করে হাঁক পাড়ছে কেন?···অ মালবি, তোর ধাড়ি ছেলে কী বলছে শোন।···ওরে

মালবি, শুনছিস তোর ছেলের নেমকহারামী কথা—আমার রান্না নাকি আর ওঁর মুখে রোচে না।'

কথার লীলা!

কথার মাধুরী!

জ্যোতিকে নিয়ে এতটা হতো না।

জ্যোতির হাতের রান্না দুর্দৈবে পড়ে ছাড়া গলা দিয়ে নামানো চলত না।

জ্যোতি সেবা যত্ন যা কিছুই করুক, তার মধ্যে 'পালাই পালাই' ভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠত।

শুধু দু'দণ্ড কাছে বসে থাকা জ্যোতির কোষ্ঠিতে লিখত না। কাজ সারা হলেই জ্যোতি ঘরে গিয়ে বই পড়ত, সেলাই করত, শুয়ে-বসে থাকত।

মালবিকার নিজস্ব কোনো 'ঘর' নেই।

মালবিকা তাই সর্বদাই কাছে কাছে।

মালবিকা স্কুলের চাকরিটা নিয়েছে বটে, তথাপি মনে হয় না সরে গেছে। যাবার সময় পর্যন্ত দেখে যায় কোথাও কোনো ত্রুটি রইল কি না। আবার এসেই কোমরে আঁচল জড়ায়।

লীলাবতী রেগে রেগে বলেন, 'আমি কি তোকে ঝি রেখেছি?'

মালবিকা হেসে বলে, 'তাই তো! 'ঝি' মানে কি নিজেই বলো।'

লীলাবতী বলেন, 'রোস্ একটা পাত্তর জুটিয়ে তোকে শ্বশুর-ঘরে পাঠিয়ে বাঁচি।'

মালবিকা বলে, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে মা! তবে দোহাই তোমার, ও শাস্তিটা মনে ভেঁজো না।'

'কেন ভাঁজব না? ভাঁজছিই তো।'

'তাহলে পিটটান দেব। ওই ভয়ে কাকার বাড়ি ছেড়েছিলাম। কাকার শালার সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে কাকী—' হেসে ফেলে মালবিকা, 'বুঝতেই পারছ পাত্রটি কেমন?'

'তা আমি কি তোকে ভাল বিয়ে দেব না? তেমনি পাত্রে ধরে দেব?'

'আমার ভালয় কাজ নেই মা! তোমার কাছে না রাখতে চাও তো ফুটপাথে ছেড়ে দাও।'

'তুমি'ই বলে।

নইলে লীলাবতী রাগারাগি করেন।

লীলাবতী যেন এই মেয়েটাকে উপলক্ষ করে বাৎসল্যের লীলায় বিকশিত হতে চান, মেয়ে যে ছিল না, তার শোধ তোলেন।

আর মালবিকা সে লীলায় আড়ষ্ট হয় না, বিরক্ত হয় না।

তাহলে?

কিন্তু এ তো গেল বয়স্ক দুই প্রাণীর চিত্তজয়ের ইতিহাস। তারা না হয় পরাভূত। কিন্তু এ সংসারের অল্পবয়স্ক সদস্যটির চিত্তের সংবাদ কি?

সেও কি ওই একই অস্ত্রে 'নিহত'?

এমনিতে তো সে বলে, 'এ বাড়ির গৃহিণী শ্রীমতী লীলাবতী দেবী কত করে মাইনে দেন আপনাকে?'

বলে, 'আত্ম-নির্যাতনেরও একটা সীমা থাকা উচিত। এটা হচ্ছে কি?···জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবকিছুর দায়িত্ব যে আপনারই, এটাই বা কোন্ চণ্ডীতে লেখা আছে বলুন তো?'

আবার কখনো কখনো গাম্ভীর্যও দেখায়। বলে, 'আমার টেবিল কারুর সাফ করবার দরকার নেই, আমি নিজেই করে নেব। আমার ঘরের পর্দা, বালিশ ঢাকা কে সাবান দিল? না না, আমি এসব পছন্দ করি না।'

'আপনি বিরক্ত হন?' মালবিকা বলে।

'হ্যাঁ, হই। দস্তুরমতো হই—' মৃণাল দৃঢ় হয়, 'এ ঘরের কোনো কাজ করবার দরকার নেই। আশ্চর্য! এ বাড়িতে তো আগে একটা ঝি ছিল দেখেছি, সেটা কোথায় গেল বলতে পারেন? ছেড়ে গেছে?'

মালবিকা ওর ভঙ্গিতে হেসে ফেলে বলে, 'ছেড়ে যাবে কেন ?'

'যায়নি তো তার বাড় এত বেড়ে গেছে কেন যে, বাড়ির লোকে ঘর সাফ করবে, সাবান কাচবে ?'

বাড়ির লোক ?

মালবিকা চোখ তুলে একবার তাকায়।

তারপর সে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, 'ওর কাজ বড় নোংরা।'

'হোক গে। তা বলে নিজের হাত নোংরা করতে হবে না।'

'হাতের কাজে হাত নোংরা হয় না—' মালবিকা হেসে বলে, 'কোনো নোংরা কাজেই নয়।'

মৃণাল ওই হাসির দিকে তাকিয়ে চোখ নামায়।

তা তিলে তিলে হয়তো এই অস্ত্রেই 'নিহত' হচ্ছে এ বাড়ির তরুণবয়স্ক সদস্যটি। একটি বুদ্ধিমার্জিত মনের সঙ্গে কথা বলার সুখ, একটি শান্ত সভ্য ধৈর্যশীল প্রকৃতির সাহচর্যের সুখ, অহরহ একটি সুকুমার সুষমার দর্শক হওয়ার সুখ, অর্থহীন জীবনের ভারগ্রস্ত দিনগুলোকে কিছুটা হালকা করতে পাওয়ার সুখ, এগুলো কি সোজা মূল্যবান ? এই মূল্যেই বিকিয়ে যাওয়া যায়।

তা'ছাড়া হাল ভেঙে যাওয়া সংসার-তরণীর সুশৃঙ্খল গতি, আর উদ্বেলিতচিত্ত প্রৌঢ় মা-বাপের চিত্তের শান্তি, এ দুটোও তাকে জয় করার কাজে লেগেছে বৈকি !

হয়তো বা ওইটাই প্রধান। পুরুষ হচ্ছে সুশৃঙ্খল সংসারযাত্রার কাঙাল। সেই পরম বস্তুটি যে তাকে দিতে পারে, পুরুষ মনে মনে তার কেনা না হয়ে পারে না।

কিন্তু মালবিকা ?

এ বাড়ির ওই কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটা ?

সে তো এ সংসারকে অনেক দিচ্ছে।

তবে নিজে কেন সে কেনা হয়ে আছে ?

কেন শত দাসত্বেও ক্লান্তি নেই তার? আর শুধু এই পাতানো মেয়ের চাকরিটুকুতেই বা এত কি সার্থকতা তার? সুখই বা কি? অথচ আছে সুখ, আছে সার্থকতা।

আছে যে সেটা তার চোখে মুখে আঁকা হয়ে গেছে।

আশাহীন ভবিষ্যৎহীন এই জীবনের মধ্যেই যেন তার পরম পূর্ণতা।

আশাহীন বৈকি।

ভবিষ্যৎহীনও।

যেখানে সে মনের নোঙর ফেলেছে, সেখানের মাটি আলগা, খুঁটি পোঁতবার ভরসা নেই।

অথচ সেই প্রথম দিন যখন অচৈতন্যের অন্ধকার থেকে উঠে এসে প্রথম চৈতন্যের দরজায় চোখ ফেলেছিল, তখনি জীবনকে বিকিয়ে বসেছিল। তারপর ধীরে ধীরে, কাজে অকাজে, আলাপে স্তব্ধতায়, ঔৎসুক্যে আর অবহেলায় ভরে উঠছে সেই মন।

মৃণাল যখন আগ্রহের চোখে তাকায়, তখন সুখে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে। মৃণাল যখন অন্যমনস্কের মতো ওকে ভুলে গিয়ে আপন হৃদয়ভাবের মধ্যে নিমগ্ন থাকে, তখন শ্রদ্ধায় বিশ্বাসে মন ভরে ওঠে।

লোকটা বাজে নয়, অসার নয়, তরলচিত্ত নয়, সুযোগ-সন্ধানী নয়।

ভালবাসার পক্ষে এই তো অনেক।

তা'ছাড়া—লীলাবতীর ভালবাসা?

তাকেও কম মনে করে না মালবিকা। যদিও তার অনেকটাই আতিশয্যের ফেনা, অনেকটাই ধরে রাখবার আকুতি, অনেকটাই আত্মবিকাশের লীলা, তবু ভিতরের বস্তুটা খাঁটি বৈকি।

মালবিকাও অনেক পেয়েছে।

পেয়েছে আশ্রয়, পেয়েছে স্নেহ, পেয়েছে সম্মান।

এবং আরো একটা দুর্লভ বস্তু!

সেটাও যে তিলে তিলে সঞ্চিত হচ্ছে মালবিকারই জন্যে, সেটাও টের পাচ্ছে মালবিকা।

মালবিকা লোভের হাত বাড়াবে না সেখানে, তবু তার জন্যেই যে জমা হচ্ছে ঐশ্বর্য সেটা জানাই কি কম সুখ?

বহু বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে মালবিকার মন তৈরি হচ্ছে। একদিকে কুণ্ঠা, লজ্জা, অনধিকার প্রবেশের অপরাধী ভাব, আর ভাল-মন্দের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের গভীর চাঞ্চল্য, অপরদিকে অনাস্বাদিত এক স্বাদের তীব্র আকর্ষণ। জীবনে কবে 'ভাল লাগার' স্বাদ পেয়েছে মালবিকা? জীবনে কবে মালবিকা কারো কাছে মূল্যবান হয়েছে?

না, শৈশবে অনাথ মালবিকা ছিল মূল্যহীন।

তাই সে প্রতিদিন মনে করেছে, এবার মায়া কাটিয়ে চলে যাই, আর প্রতিদিনই আরো একপাক বন্ধনের গ্রন্থীতে আটকে গেছে।

কলকাতায় এসে পড়ে যখন তখুনি যেতে পেল না মালবিকা, তখন ভাবল, তা' বেশ, চশমাটাই হোক। ওটা না হলে তো কিছুই হবে না। দয়ার দানই নিতে হবে।

মৃণাল হেসে বলেছিল, 'চক্ষুদান'।

মালবিকা মনে মনে বলল, 'দৃষ্টিদান'। পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম তোমার মহত্ত্বে, তোমার সুষমায়।

চশমাটা যেদিন হলো, সেদিন মৃণাল অফিসে জয়েন করেছে।

দুপুরবেলা খালি ঘরটা ঝাড়তে ঢুকল মালবিকা। আজই তো প্রথম স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে, সেলফে কী কী বই, দেয়ালে কার কার ছবি, টেবিলে দাঁড় করানো স্ট্যাণ্ডটায় যে ছবি, তার মুখটা ঠিক কেমন।

দেখল, দেয়ালে দেয়ালে শুধু একটি রমণীয় রমণীমূর্তির বহুভঙ্গী। বিয়ের পর কিছুদিন ধরে চলেছিল ওই ফটোর মাতামাতি।

জ্যোতি বলত, 'এত ছবি দেয়ালে টাঙাবার দরকার কি? অ্যালবামে থাক না?'

'আহা, অ্যালবামে তো রয়েইছে—' মৃণাল বলত, 'কত রয়েছে, এনলার্জড্‌গুলো অ্যালবামের জন্যে নয়।'

'তোমার সারা দেয়ালে কেবল আমি, লজ্জা করে না বুঝি?'

'আমার সারা পৃথিবীতেই তো তুমি, লজ্জাটা তবে তুলে রাখবে কোথায়?'

'মা ঘরে ঢোকেন, ভারী ইয়ে হয়—'

'মা বাবার সামনে তুমি বেরোচ্ছ না? ঘুরছ না, ফিরছ না? হাসছ না, কাজ করছ না? তবে? ছবিগুলো দেখলেই দোষ?'

'ওটা একটা যুক্তি হলো? আমি হলাম শুধু আমি, আর ছবিগুলো হলো তোমার আমি।'

'মা'র যদি বাস্তব বুদ্ধি থাকে, তো বুঝবেন দুটোই এক। সব 'তুমি'টাই আমার।'

'তা' বলে কেউ বৌয়ের এত ছবি তুলে দেয়ালে ঝুলোয় না। জানো, মা তোমায় বলেন, 'কী বেহায়া'!'

'সব মায়েরাই বলে থাকেন। ছেলে বৌকে ভালবাসলেই বেহায়া।'

'সে ভালবাসার ছবি তুলে রাখলে তবে কি হয় বলো?'

বলে নিজেই নতুন করে ভালবাসার ছবি হয়ে যেত জ্যোতি।

নতুন চশমা পরে সেই বহু আলোচিত আর বহু ভঙ্গির ছবিগুলি দেখতে পেল মালবিকা। অবর্ণনীয় একটা যন্ত্রণাবোধ হতে লাগল। আস্তে টেবিলে রাখা শুধু একখানি মুখকে দেখতে লাগল অপলকে।

আস্তে আস্তে সেই মুখও যেন জীবন্ত হয়ে উঠে তাকিয়ে থাকে মালবিকার দিকে। কিন্তু সেই মুখটায় কোনো অভিযোগ নেই, বিদ্রূপ নেই, করুণার ভঙ্গি নেই। শুধু হাস্যোজ্জ্বল। শুধু সুখের সাগরে ভাসা 'রাণী-রাণী' ভাব।

অনেকক্ষণ দেখতে দেখতে হঠাৎ ওই রাণী-রাণী মুখটার প্রতিই করুণা এল মালবিকার।

মনে মনে বলল, 'কী দুঃখী তুমি, কী দুঃখী!'

নিজের সেই যন্ত্রণা-যন্ত্রণা ভাবটা মুছে গেল, শুধু যেন একটা অপরাধিনী ভাব রয়ে গেল।

সেটাই রয়ে গেছে বুঝি আজও, অথবা বাড়ছে।

অথচ তারপর কত দিন চলে গেল, কত সান্নিধ্য আর সাহচর্যে সহজ হয়ে উঠল ব্যবহার। এখন এ-বাড়ির কুড়নো মেয়েটাও এ-বাড়ির মালিকের ছেলেকে বকতে পারে, শাসন করতে পারে।···

অনুক্ত বাণীতে কোথায় যেন একটা অধিকারের দাবি ঘোষিত হয়ে গেছে।

এখন আর মনে পড়ে না, ওই 'মালবিকা' নামের মেয়েটা এ-বাড়িতে কোনোদিন ছিল না।

এখন আর চোখে পড়ে না, এ-বাড়ির একটা ঘরের দেয়াল জুড়ে 'জ্যোতি' নামের একটা মেয়ের দেদার ছবি ঝোলানো রয়েছে।

এখন আর বোধহয় কোনোদিন সেই ছবি-ঝোলানো ঘরের মালিক ঘুম না হওয়া রাত্রে জানলায় দাঁড়িয়ে ব্যাকুল প্রশ্নে উত্তাল হয়ে ওঠে না, 'জ্যোতি, তুমি কি তা'হলে সত্যিই হারিয়ে গেলে?··· জ্যোতি, তুমি যেখানেই গিয়ে পড়ে থাকো, একটা চিঠিও তো দিতে পারতে?···জ্যোতি, তুমি তবে মারা গেছ? জ্যোতি, ওই আকাশের তারাদের সঙ্গে কি মিশিয়ে গেছ তুমি?'

হয়তো এখন সে বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

হয়তো আর কোনো মুখ তার স্বপ্নে ছায়া ফেলে, যে মুখ জ্যোতির নয়। সময়ের ধুলোয় জ্যোতির মুখ ক্রমশঃই ঝাপসা হয়ে আসছে।

॥৩২॥

দিন যাচ্ছে, যাচ্ছে রাত্রি!

সূর্য আপন কক্ষে আবর্তিত হচ্ছে। নিত্যনিয়মে পৃথিবী তাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে, ঋতুচক্রের আবর্তন অব্যাহত।

এই 'গতি' রচনা করে চলেছে ধুলোর বৃত্ত। আর সেই ধুলোর স্তর পড়ে চলেছে জীবন, চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, জগৎ-সংসারের সবকিছুর ওপর। ঢাকা পড়ে যাচ্ছে নীচের ভূমি, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে আগের রং।

'জ্যোতি' ক্রমশঃ শুধু একটি ফ্রেমে বাঁধা ছবি হয়ে যাচ্ছে।

মালবিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে সেই ঝাপসার ওপর। এখন শুধু একটি সমারোহময় অভিষেকের অপেক্ষা।

সে অভিষেকের প্রস্তুতি যবনিকার অন্তরালে কম্পমান।

কিন্তু মৃণাল কি এতই অপদার্থ? এত শীঘ্র জ্যোতিকে ভুলে গেল? খুঁজল না তাকে ভাল করে? হারিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইল?

জ্যোতির জন্যে কোনো কিছু ত্যাগ করল না? জ্যোতির ধ্যানে সমাহিত হয়ে রইল না?

সাধারণ মানুষের মতোই খেলো, ঘুমলো, কাজ করল, দোকান গেল, বই পড়ল, কথা বলল? তাহলে তো ধিক্ তাকে!

না, এতটা অবিচার করা চলে না মৃণালের ওপর। করেছিল বৈকি অনেক কিছু। হারিয়ে-যাওয়া মানুষকে খোঁজবার যা যা উপায়-পদ্ধতি আছে সংসারে, তার সবই করেছিল। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, পুলিস-ঘর করেছিল, উড়ো-ভাসা কোনো খবর পেলেই ছুটেছিল সেখানে, চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

তিন-তিনটে বছর তো কম নয়! কতই করল! এরপর আর কি করবে?

ক্রমশঃ মেনে নিয়েছে অমোঘ অনিবার্যকে।

যেমন মেনে নেয় মানুষ মৃত্যুকে। মৃত্যুর শূন্যতাকে।

অপূরণীয় ক্ষতিও যখন ঘটে, তখন করবার কিছু থাকে কি? পরম প্রিয়জন চলে যায়, হয়তো একে একে সবাই যায়, তবু তারপরও মানুষকে চলতে হয় সংসারপথে। আত্মহত্যা করে জীবনের শেষ করে না ফেললে, চলতেই হবে যথাযথ নিয়মে। দেহটাই যে প্রধান শত্রু, আর পরম প্রভু। দেহ থাকলে সবাইকে রাখতে হবে।

প্রথমটায় তো এ চাকরি ছেড়ে দিতে চেয়েছিল মৃণাল, ছেড়ে দিতে চেয়েছিল এই ফ্ল্যাট, এই পাড়া, এই শহর।

আত্মীয়-বন্ধু পরিচিত সমাজ, ছাড়তে চেয়েছিল সবাইকে।

কিন্তু ভক্তিভূষণ একটি পরম প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। স্থিরবুদ্ধি গৃহকর্তা ভক্তিভূষণ বললেন, 'এ বাসা ছেড়ে দিলে কোনোদিনই আর তাকে পাবার আশা থাকবে না।'

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল মৃণাল। উপলব্ধি করেছিল এ কথার সত্যতা।

সত্যিই আশা থাকবে না। খবর যা-কিছু আসবে. এই ঠিকানাতেই আসবে।

চিঠি যদি কারো আসে, এই ঠিকানাতেই আসবে। আর— ?

আর নিজে যদি কোনোদিন এসে হাজির হতে পারে সে, এই বাসার দরজাতেই আসবে। তবে? তবে আর কি, ছাড়া হলো না বাসা। আর বাসাই যদি ছাড়া হলো না তো কাজ ছাড়া চলে কি করে? অতএব দৃশ্যতঃ ওই মৃত্যু-সংবাদটাই চালু করতে হলো। খোঁজাখুঁজি চলতে লাগল তলে তলে।

আর বলতে গেলে তো মৃত্যুই।

যাকে আর পাবার আশা নেই, সে মৃত ছাড়া আর কি? খোঁজাটা আত্মমর্যাদা। নিশ্চেষ্ট থাকাটা নিজের কাছে নিজেকে ছোট করা। নিজের কাছে, সংসারের কাছে, আর বাড়িতে-এসে-

পড়া ওই অতিথিটির কাছেও সম্ভ্রম বজায় রাখতে বহুদিনই চলল ব্যর্থ চেষ্টার পুনরাবৃত্তি।

সেই চেষ্টায় অংশগ্রহণ করেছে মালবিকাও।

মালবিকা কাগজের অফিসে গিয়েছে, মালবিকা মৃণালের সঙ্গে পুলিস-অফিসে গিয়েছে।

লীলাবতী বলেছেন, 'ওই মন-ভাঙা ছেলে একা যায়, আর আরো মন ভেঙে বাড়ি ফেরে। এমন একটা কেউ নেই যে সঙ্গে সঙ্গে যায়। আমার ইচ্ছে করে—যাই ওর সঙ্গে।'

তখন মালবিকা বলেছে, 'আমি তো বেকার বসে আছি, যেতে পারি।'

এতে কেউ আশ্চর্য হয়নি। কারণ, এ যুগে মেয়েতে ছেলেতে কাজের পার্থক্য নেই। লীলাবতীর যুগ নয় যে, ইচ্ছে নিয়ে ঘরের খাঁচায় পাখা ঝাপটাবে বসে বসে। এ যুগে মেয়ে যে মেয়ে, সেটা প্রমাণ হয় শুধু লুঠের সময়। রাবণের আমল থেকে এ ঐতিহ্যটা অব্যাহত আছে কিনা!

মালবিকা বলেছিল, 'যেতে পারি।'

যেত। প্রায়ই যেত।

সেই একত্র যাওয়া-আসার সূত্রেই হয়তো অলক্ষ্যে একটি বন্ধন-সূত্র রচিত হতে থাকল। চাঁদের মা বুড়ি অবিরাম চরকা চালিয়ে যে সুতো বাতাসে উড়িয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়, সেই সুতোই তো ওই বন্ধনের কাজে লাগে।

বাঁধা যে পড়েছে, এ আর কারো অবিদিত থাকছে না। আর অবিদিত থাকছে না বলেই যেন সাহসটা যাচ্ছে বেড়ে, অধিকারবোধটা আসছে সহজে।

এখন মৃণাল অনায়াসেই বলতে পারছে, 'লাইট-হাউসে একটা ভাল ছবি এসেছে, চল না দেখে আসা যাক।'

'তুমি'ই চলছে। লীলাবতীই বলে বলে ভয় ভাঙিয়েছেন।

বলেছেন, 'হ্যাঁরে, আমি মেয়ে বলি, আর তুই ওকে আপনি-আজ্ঞে করিস ?'

তখন তখন মৃণাল উত্তর এড়িয়েছে। বলেছে, 'ভালই তো! মান্য-ভক্তি করি তোমার মেয়েকে।'

'থাম বাপু! না না, 'তুমি' বলবি। বাড়ির মধ্যে ঘরের মেয়েকে 'আপনি-আপনি' করিস, শুনতে ভাল লাগে না।'

মৃণাল হাসত। মালবিকাকে উদ্দেশ করে বলত, 'এই শুনুন! মাতৃদেবীর আদেশ পালনার্থে আপনাকে 'তুমি' বলতে হবে।'

মালবিকা হাসত, 'ভালই তো।'

'এখন তো বলছেন ভাল। এরপর হয়তো মান্য-ভক্তি কমে যাচ্ছে ভেবে রাগ হবে।'

'রাগতে দেখলে আবার না হয় 'আপনি' ধরবেন।'

এইভাবেই সহজ হওয়া। 'তুমি'তে নেমে আসা।

তারপর নিত্যদিনের সাহচর্যে, কখনো চকিত একটু হাসির মধ্যে, কখনো গভীর একটু চাওয়ার মধ্যে, কখনো বেদনার মধ্যে সেই সহজ এসে দিয়েছে ধরা।

ক্রমশঃ বলা যাচ্ছে, 'লাইট-হাউসে একটা ভাল ছবি এসেছে, চল না, দেখে আসা যাক।' বলা যাচ্ছে, 'এই, তুমি যে কি বইয়ের কথা বলছিলে সেদিন, চল না কিনে আনা যাক।'

মালবিকা যদি বলে, 'বই লাইব্রেরী থেকে এনে পড়ে নিলেই চলবে', মৃণাল তাকে ভাল বই কাছে রাখা সম্পর্কে যুক্তি দেখায়।

মালবিকা যদি বলে, 'থাক না, ছবি দেখে আর কি হবে', মৃণাল ছবিটির পাবলিসিটিতে পঞ্চমুখ হয়।

প্রথম প্রথম, যখন সংসারের গুমোটটা হালকা হয়ে এসেছে, যখন চক্ষুলজ্জাটা কেটে আসছে, তখন মৃণাল বলত, 'মা, সন্ধ্যাটা তো

তোমরা বাড়ি বসে কাটাও দেখি, একটা ছবি-টবি দেখে এলে পার। যাবে তো বলো।'

লীলাবতীরও এ ইচ্ছে হয়েছে কখনো।

নিজের জন্যে না হোক, মালবিকার জন্যে। কিন্তু চক্ষুলজ্জায় তুলতে পারেন না এ-কথা। জ্যোতি যে সিনেমা-পাগল ছিল!

কিন্তু আরো অনেক জিনিসের মতো এতেও চক্ষুলজ্জা কাটানোয় মৃণালই সাহায্য করেছে। জ্যোতির বইয়ের আলমারির চাবি মালবিকার হাতে পড়েছে মৃণালের হাত থেকেই।

॥ ৩৩ ॥

তা, প্রথম প্রথম লীলাবতীর সঙ্গে।

কিন্তু ওদের যে ইংরিজি ছবিতে মন।

লীলাবতী বলেন, 'ও বাপু তোরাই যা। আমি বুঝি-সুঝি না।'

ভক্তিভূষণ মাঝে মাঝে এ ব্যবস্থায় প্রশ্ন তুলেছেন, লীলাবতী বলেছেন, 'তাতে আর কি হয়েছে? আজকাল কি আর ওসব শুচিবাইপনা আছে?'

লীলাবতী তো বলবেনই। তিনি যে একটি গোপন ইচ্ছে লালন করছেন মনে মনে।

ভাবতে কষ্ট হচ্ছে, বুকের মধ্যেটা মোচড় দিয়ে উঠছে, তবু ভাবছেন। ভাবছেন, সে তো আর আসবে না, ছেলেটা তবে সারাটা জীবন কাটাবে কি নিয়ে?

ভাবছেন, দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ের নজীর কি নেই?

এমনিতেই তো আত্মীয়-স্বজন সকলেই বলছে, 'এই বয়েস, একটা বাচ্চা-কাচ্চা পর্যন্ত নেই, ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

লীলাবতী তখন পৃষ্ঠবল পাচ্ছেন।

॥ ৩৪ ॥

কিন্তু মালবিকা ? তার কি চক্ষুলজ্জার বালাই নেই ?

সে একদিন ঝড়ের মুখে ছেঁড়া পাতার মতো উড়ে এসে জুড়ে তো বসেছে অনেকখানি। আবার রাজসিংহাসনেও বসতে চায় ?

সে কি এ-বাড়িতে জ্যোতির সাম্রাজ্যের চিহ্ন দেখেনি ? কোনো-কোনো নির্জন মুহূর্তে বিষাদস্তব্ধ মৃণালের অনন্ত আকাশে হারিয়ে যাওয়া মুখ দেখেনি ? দেখেনি জ্যোতির ভালবাসা-ভরা আর সুখে-ভরা জীবনের অজস্র খুঁটিনাটির সঞ্চয় ?

লীলাবতী কেঁদে কেঁদে বলেছেন, 'একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে রাখ মা, যদি কখনো আসে। এইসব তুচ্ছ জিনিসে কী আগ্রহ ছিল তার!'

বলেছেন অবশ্য সেই অনেক দিন আগে। এখন আর বলেন না।

এখন অবিরতই বলেন, 'জানতেই পারছি সে আর নেই। থাকলে কোনোমতে একছত্র চিঠিও কি দিত না ? আমরা নাহয় তার ঠিকানা জানি না, সে তো আমাদের ঠিকানা জানে!'

এখন আর বলেন না, কিন্তু যখন বলতেন, রাখত মালবিকা তার জিনিস ঝেড়ে-ঝুড়ে। এখনো রাখে নিজে থেকে। আলমারি-ভর্তি জামাকাপড়, বাক্স-ভর্তি পুঁতির মালা, কৌটা-ভর্তি কাঁচের চুড়ি।...

আর—অবিরতই তো ঝাড়ছে জ্যোতির ছবি, জ্যোতির খেলনা-পুতুল, জ্যোতির বইয়ের সংগ্রহ। এইসবের অধিকারিণী হয়ে বসতে লজ্জা হবে না তার? আর লজ্জা হবে না জ্যোতির বরকে নিয়ে নিতে ?

॥ ৩৫ ॥

তা, লজ্জা নেই বলা যায় কি করে ?

সেদিন মৃণাল ওর মুখোমুখি বসেছিল আর ওর একটা হাত

চেপে ধরে বলে উঠেছিল, 'এত ভার নিতে পেরেছ, আমার ভারটাও নাও এবার। আর বইতে পারা যাচ্ছে না।'

পার্কের বেঞ্চে বসেছিল দু'জনে, সন্ধ্যা নেমে আসছিল পৃথিবীতে। সেই সন্ধ্যার চোখে তাকিয়েছিল মালবিকা।

বলেছিল, 'লজ্জা বলে একটা শব্দ কি নেই জগতে?'

'আমার জগতে অন্ততঃ আর নেই মালবিকা,' বলেছিল মৃণাল, 'আমি এবার হার মেনেছি।'

'কিন্তু আমি যে হার মানতে রাজী নই, আমার লজ্জা আছে।'

'তবু আমার অবস্থা ভাবো মালবিকা, আমি একটা রক্ত-মাংসের মানুষ, শুধু ছায়া নিয়ে আর কতদিন টিকে থাকব? আমাকে তো বাঁচতে হবে!'

॥ ৩৬ ॥

বাঁচতে হবে!

জগতের পরমতম এবং চরমতম কথা। বাঁচতে হবে! বাঁচতে হবে! নিখিল বিশ্বের অণুপরমাণুটি পর্যন্ত এই কথাই বলে চলেছে। বাঁচতে হবে।

মৃণালকেই বা তবে লজ্জাহীন বলা চলে কি করে?

মৃণাল শুধু সেই চিরকালীন কথাটাই বলেছে। আর বাঁচতে হবে বলেই বলেছে, 'মালবিকা, তুমি আমার ভার নাও। আমি আর পারছি না।'

মালবিকা আস্তে ওর হাতে হাত রেখে বলেছে, 'আমি যদি না আসতাম, আমি যদি নির্লজ্জের মতো, লোভীর মতো এখানে পড়ে না থাকতাম, হয়তো ওই ছায়া নিয়েই বেঁচে থাকতে পারতে তুমি!'

'সেটা আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু হতো না।'

'এখন তাই ভাবছ, তখন হয়তো তা ভাবতে না। ওই ছায়াই তোমার জীবনে চিরসত্য হয়ে থাকত।'

'কি হলে কী হতো, সে কথা আর ভাবা যাচ্ছে না মালবিকা, এখন আমি জেনেছি মৃত্যুর চেয়ে জীবন অনেক বড়।'

'মৃত্যু মহান্, মৃত্যু পবিত্র!'

'জীবন সুন্দর, জীবন ঐশ্বর্যময়!'

'কিন্তু বেশ তো চলে যাচ্ছে।'

'একে বেশ চলা বলে না মালবিকা! এই বেশ ভাবাটাও আত্মপ্রবঞ্চনা।'

'আমার ভয় করে। মনে হয় অন্যায় করছি।'

'ভয়ের কিছু নেই মালবিকা! সত্যকে স্বীকার করাই সততা।'

'আমি যদি চলে যাই, হয়তো আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে?' মৃণাল ওর হাতটা চেপে ধরে বলেছে, 'সেই 'ঠিক'টা কী তা তুমি বলতে পার? তুমি চলে গেলে জ্যোতি ফিরে আসবে?'

মালবিকা মাথা নিচু করেছে।

তারপর আবার বলেছে, 'তা নয়। তবু তুমি হয়তো তোমার আসল 'মন'কে ফিরে পাবে। এখন একটা ঝোঁকে পড়ে—'

'তিলে তিলে নিজেকে যাচাই করেছি মালবিকা! অহরহ অনন্ত শূন্যতায় মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে দেখেছি। আমার বাইরের চেহারাটাই দেখতে পেয়েছ, আমার ভিতরের যুদ্ধের চেহারাটা দেখতে পাওনি। কিন্তু আমি যুদ্ধে জয়ী হতে পারিনি।'

'পরাজয় তো লজ্জার।'

'পরাজয় স্বীকার করাটা গৌরবের।'

'লোকে কি বলবে?'

'লোক? লোকে কি বলবে? সেটাও ভেবেছি বৈকি।

লোকভয়েই তো আজকের পরিস্থিতির উদ্ভব।...কিন্তু এখন যদি শুধু এইভাবে 'বেশ আছি' বলে কাটিয়ে দিতে যাই, লোকে সহ্য করবে না। লোকে আরো অনেক কিছু বলবে। তার চাইতে যা স্বাভাবিক, যা বাস্তব, তাই ধরে দেওয়া ভাল তাদের সামনে।'

মালবিকা অনেকক্ষণ কথা বলেনি। তারপর ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেছে, 'লোকে হয়তো বলবে—বিয়ে না করে উপায় ছিল না বলেই নিশ্চয়—'

মৃণাল ওর ধরে-থাকা হাতটায় চাপ দিয়ে বলেছে, 'তা যদি বলে, সেটা ভুল বলবে না। সত্যিই আমার আর উপায় থাকছে না। অবিরতই এই অদ্ভুত অবস্থাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রবল হয়ে উঠছে আমার মধ্যে।'

'মাকে তুমি বলবে কোন্ মুখে?'

'মুখে বলতে হবে না। আমার মুখেই সে কথা লেখা হয়ে চলেছে। সে লেখা পড়বার বিদ্যে মা'র আছে।'

'বাবা তাহলে আমার মুখ দেখবেন না।'

'সময়ে সবই হয়ে যাবে। মানুষ অবস্থার দাস।'

'আর যদি কোনোদিন তিনি—'

'সে কল্পনা আর করি না মালবিকা! সব কিছুই বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করতে হয়।'

'আমার মনে হয় এত সুখ আমার কপালে সইবে না।'

'চুপ করো। ওই সব কথা বোলো না। মেয়ে জাতটারই দেখছি অকারণ অমঙ্গল চিন্তা করা স্বভাব। ওতে অমঙ্গলকে ডেকেই আনা হয়।'

'তাহলে তুমিও মেয়েদের মতো ওইসবে বিশ্বাসী।'

'বিশ্বাসী কিনা জানি না। তবু ও আমার ভাল লাগে না। আমরা পরস্পরকে চাই একথা আর অস্বীকার করবার জো নেই, তা

তুমিও জান আমিও জানি। তবে মিথ্যে কেন মরুভূমি সৃষ্টি করে বসে থাকব বলতে পার?'

'তোমার কাছে কথায় কে পারবে?'

বলে মৃদুহাসির মুখ নিয়ে তাকিয়ে থেকেছে মালবিকা।

মৃণাল বলেছে, 'আমি যে রক্তমাংসের মানুষ একথা স্বীকার করতে পেরে আমি বেঁচেছি। বিবেকের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। আমার 'ভীরুতা' আমার 'স্বর্গীয় প্রেমের' ছদ্মবেশ নিয়ে বসে থাকবে এ অসহ্য!'

'কোন্‌টা যে কি তা এখনি ঠিক বুঝতে পারছ?'

'পারছি বৈকি। প্রতিনিয়ত পারছি।'

দিনের পর দিন এমনি কথা গেঁথে গেঁথে চলেছে মালা রচনা।

তারপর একদিন মালবিকাকে বলতেই হয়েছে, 'নাঃ, লজ্জা সরম আর রাখতে দিলে না তুমি আমার।'

॥ ৩৭ ॥

লীলাবতীর চোখে জলের কণা ভাসছে, কিন্তু লীলাবতী আহ্লাদে ভাসছেন। আশা করেননি এ দিন আসবে তাঁর। আশা করেননি আবার তিনি সংসার পাবেন, আবার তাঁর মৃণাল 'জোড়া-গাঁথা' হবে

তাছাড়া—দেখছেন তো! বুঝছেন তো, মেয়েটা মৃণালের জন্যে মরছে।

মৃণাল হেঁটে যায় তো ওর বুকে বাজে। মৃণাল কথা কয়, ও চেয়ে থাকে। আর ক্রমশঃই তো দু'জনে দু'জনের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠছে।

তবে আর দ্বিধা কিসের?

'দিন একটা দেখাও এবার।' স্বামীর কাছে এসে বললেন লীলাবতী।

ভক্তিভূষণ শুকনো গলায় বললেন, 'দিন দেখাদেখির কি আছে? আজকাল যা বিয়ে হচ্ছে, সেই বিয়েই হোক।'

'কেন, আমাদের দিশী বিয়ে হবে না?' লীলাবতী ক্ষুণ্ণ হন।

ভক্তিভূষণ বলেন, 'তোমার দিশী বিয়েতে 'সম্প্রদানকর্তা' নামের একটা লোক লাগে। তাকে পাচ্ছি কোথায়?'

'ওর তো কাকা আছে?'

'দোহাই তোমার! সেই কাকাকে পায়ে ধরে নিয়ে আসতে হুকুম করো না আমায়।'

লীলাবতী তীক্ষ্ণ গলায় বলেছেন, 'তোমার কি এ বিয়েতে মত নেই?'

'তা তো বলিনি—' ভক্তিভূষণ বলেছেন, 'আমি শুধু বলেছি যেটা শোভন, সেটাই ভাল।'

॥ ৩৮ ॥

মালবিকাও তাই বলে, 'দোহাই মা, বেনারসী কিনতে বোসো না আমার জন্যে, যেটা শোভন সেটাই ভাল।'

আর দু'জনে মিলে নোটিস দিতে যাবার দিন সেই শোভন সাজই সাজতে বসেছে মালবিকা।

শুধু চোখে-মুখে একটু প্রসাধনের ছোঁওয়া, শুধু একখানি নতুন তাঁতের শাড়ি। আর কিছু না।

মৃণাল এসে দরজায় দাঁড়ায়। বলে, 'হলো?'

'বাঃ, এক্ষুনি হবে? সাজব না?'

'তবু ভাল, তোমার মুখে শুনলাম একটা নতুন কথা। সেজো, সেইদিন খুব করে সেজো। আজ দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

মালবিকা আলোকোজ্জ্বল মুখে বেরিয়ে এল। লীলাবতীকে প্রণাম করল।

ভক্তিভূষণের সামনে যেতে লজ্জা করছে। আজ আর যাবে না, একেবারে সেই দিন যাবে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। ভাবল, আকাশে কত সোনা! তবু দরজা থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়াল মালবিকা। বলল, 'লেটার-বক্সে চিঠি এসে পড়ে রয়েছে. খামের চিঠি।'

বটুয়া থেকে ছোট্ট তালার চাবিটা বার করল।

মৃণাল অসহিষ্ণু হচ্ছিল। বলল, 'ফিরে এসে বার করলেই হবে, দেরি হয়ে গেছে।'

'আহা, এতে আর কত সময় যাচ্ছে—'

চাবিটা খুলল। বলল, 'খুব দরকারি চিঠিও তো হতে পারে।'

তারপর বার করল। একটা ইলেকট্রিক বিল, মৃণালের ক্লাবের কি একটা ফাংশনের কার্ড, আর একখানা ইন্‌ল্যাণ্ড লেটার।

সেটা হাতে করে স্তব্ধ হয়ে গেল মালবিকা। শূন্য সাদা চোখে তাকিয়ে চিঠিশুদ্ধ হাতটা বাড়িয়ে দিল মৃণালের দিকে। এ অক্ষর তার অপরিচিত নয়। এ বাড়ির সর্বত্র ছড়ানো দেখেছে এই অক্ষর। গানের খাতায়, ডায়েরির খাতায়, ধোবার খাতায়, গয়লার খাতায়।

॥ ৩৯ ॥

অনন্তকাল পার হয়ে গেল।

তেমনি শূন্য সাদা চোখে তাকিয়ে রইল দু'জনে পরস্পরের মুখের দিকে।

অনেক অনেকক্ষণ পরে শতাব্দীর ঘুম ভেঙে মালবিকা বলল, 'খুলে দেখ। হয়তো খুব দরকারি।'

দরকারি। সত্যিই দরকারি। কিন্তু সেটা কার?

॥ ৪০ ॥

'কার ? কার চিঠি ?' অনেকদিন পরে আবার গলা ভাঙল লীলাবতীর। বললেন, 'কী লিখেছে ?'

মৃণাল খোলা চিঠিটা মায়ের দিকে এগিয়ে দিল।

লীলাবতী বললেন, 'আমি পড়তে চাই না। তোমরাই পড়।' লীলাবতীর গলাটা কর্কশ শোনাল।

ভক্তিভূষণ আস্তে তুলে নিলেন চিঠিটা, নিরুচ্চারে পড়লেন ঃ

'শ্রীচরণকমলেষু,

প্রেতলোক থেকে উঠে এসে এই চিঠি লিখছি। কত বছর হলো ? তিন বছর না ? তিন বছরে তিনশো বছরের ইতিহাস উঠেছে জমে।

কিন্তু সে যাক, কোনোমতে আবার কলকাতায় এসেছি। বড্ড ইচ্ছে করছে একবার দেখি। সেটা সম্ভব করা কি একেবারেই অসম্ভব ? যদি অসম্ভব হয় তো থাক। যদি সম্ভব হয়, সোমবার বিকেল পাঁচটার সময় একবার কলেজ স্ট্রীটে আমাদের সেই পুরনো বইয়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িও।

ভয় নেই, তিনশো বছরের ইতিহাস শোনাতে বসব না, শুধু দূর থেকে একবার দেখব। প্রণাম নিও। ইতি—

জ্যোতি।'

'আমাদের সেই বইয়ের দোকানের সামনে' লিখে আবার 'আমাদের'টা কেটেছে। শুধু 'সেই বইয়ের দোকানের' উল্লেখটা রেখেছে।

ভক্তিভূষণ চিঠিখানা আবার ছেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে অস্ফুটে বলেন, 'সোমবার মানে আজ।'

তারপর দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এখন চারটে দশ।'

মৃণাল কারো দিকে না তাকিয়ে যেন বাতাসকে বলল, 'যাচ্ছি।'

'যাচ্ছিস?' হঠাৎ যেন ছিটকে উঠলেন লীলাবতী। তেমান ভাঙা কর্কশ গলায় বলে উঠলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস? কোথাও যাবি না। মনে কর এ চিঠি পাসনি তুই।'

মৃণাল তবু যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বলল, 'ওকে নিয়ে আসছি।'

লীলাবতী বসে পড়লেন। বললেন, 'ওকে নিয়ে আসছিস?'

মৃণালের প্রেতাত্মার গলা বলল, 'আসছি বৈকি।'

'তাকে তুই গ্রহণ করবি? কত তুচ্ছয় বৌকে ত্যাগ করে লোকে—'

মৃণাল দাঁড়াল। মা'র চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, 'যাকে রক্ষা করতে পারিনি, তাকে ত্যাগ করব কোন্ মুখে?'

'তা বলে সেই অশুচি অপবিত্রকে—' লীলাবতী কেঁদে ফেললেন, 'শত্রু, মহাশত্রু আমার! বারে বারে কেবল আমার ঘর ভাঙছে। ওকে এনে কি করবি? ওর হাতে আমি জল খাব?'

'খাবার জন্যে তোমায় জোর করব না মা!' মৃণাল মুখ ফেরায়। আবার পা বাড়ায়। এখানে আর কেউ আছে, দেখতে পায় না যেন।

চলে যাচ্ছে। আনতে যাচ্ছে এ সংসারের অধিকারিণীকে।

লীলাবতী ফেটে পড়েন, 'আর এর কী হবে? এই পোড়াকপালীর? ধর্মজ্ঞানী মহাপুরুষ, বলে যা সে কথা?'

এতক্ষণ পরে নাটকের নীরব দর্শক মালবিকা এখন হঠাৎ একটু হেসে ফেলে কথা বলে ওঠে, 'কী মুশকিল, সেটা আবার একটা ভাবনা নাকি? বিশেষণটা তো মা দিয়েই দিলেন।'

মৃণালের দিকে এগিয়ে যায় একটু, বলে, 'এই, তুমি নিশ্চয় ট্যাক্সি নেবে? দেরি হয়ে গেছে। ওদিকেই তো শেয়ালদা? আমাকে আমার সেই বান্ধবীর হোস্টেলে একটু নামিয়ে দিয়ে যেতে পারবে না?'

প্রায় সহজ শোনাল ওর গলা। যেন মাত্র একটু বেড়াতে এসেছিল। যেন ট্যাক্সিতে ওই নামিয়ে দেওয়াটা খুবই সাধারণ ঘটনা।

মৃণাল ওই 'প্রায়-হাসির' আভাস লাগানো মুখটার দিকে কয়েক সেকেণ্ড নিনিমেষে তাকিয়ে থেকে বলল, 'চল।'

—